সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

প্রথম খণ্ড

সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ	কমিশন প্রধান	
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের	সদস্য	
জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য	
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক	সদস্য	
ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট	সদস্য	
জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য	
জনাব ফিরোজ আহমেদ	সদস্য	
জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ	সদস্য	
জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪)
জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ -)।

সূচিপত্র

প্রথম খন্ড	
ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	১
কমিশনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ	৫
প্রথম অধ্যায়- বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা	১৩
সংবিধানের পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন	৩২
দ্বিতীয় অধ্যায়- সুপারিশসমূহ	৪৫
প্রস্তাবনা	৪৫
নাগরিকতন্ত্র	৪৬
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা	৪৮
আইনসভা	৫১
নির্বাহী বিভাগ	৫৫
বিচার বিভাগ	৬২
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ	৬৫
স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	৬৯
বিবিধ	৭১
তৃতীয় অধ্যায়- সুপারিশের যৌক্তিকতা	৭৩
প্রস্তাবনা	৭৩
নাগরিকতন্ত্র	৭৪
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা	৭৭
আইনসভা	৮৬
নির্বাহী বিভাগ	৯৫
বিচার বিভাগ	১০৪
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ	১১৪
বিবিধ	১১৫
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট ১ - প্রজ্ঞাপন-১	১১৭
পরিশিষ্ট ২ - প্রজ্ঞাপন-২	১১৯
পরিশিষ্ট ৩ - প্রজ্ঞাপন-৩	১২০
পরিশিষ্ট ৪ - যে সব দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়েছে তার তালিকা	১২১
পরিশিষ্ট ৫ - রাজনৈতিক দলের তালিকা ১ (তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দল)	১২৩
পরিশিষ্ট ৬ - রাজনৈতিক দলের তালিকা ২ (তালিকার বাইরে যারা প্রস্তাব জমা দিয়েছে)	১২৪

পরিশিষ্ট ৭ - সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর তালিকা	১২৫
পরিশিষ্ট ৮ - পেশাজীবী সংগঠনগুলোর তালিকা	১২৭
পরিশিষ্ট ৯ - নাগরিকদের তালিকা	১২৮
পরিশিষ্ট ১০ - সংবিধান বিশেষজ্ঞদের তালিকা	১৩০
পরিশিষ্ট ১১ - ওয়েবসাইট বিষয়ে তথ্য	১৩১
পরিশিষ্ট ১২ - জরিপ বিষয়ে তথ্য	১৩২
পরিশিষ্ট ২০ - সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা	১৩৬
পরিশিষ্ট ২১ - গবেষকগণের তালিকা	১৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট ১৩ - ১২১ দেশের সংবিধানের পর্যালোচনার ফল	
পরিশিষ্ট ১৪ - ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত মতামত এবং অনলাইন পিডিএফ থেকে প্রাপ্ত জনগণের মতামত	
পরিশিষ্ট ১৫ - জরিপের ফলাফল	

তৃতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট ১৬ - রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের সারাংশ	
পরিশিষ্ট ১৭ - সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর মতামতের সারাংশ	
পরিশিষ্ট ১৮ - ব্যক্তির মতামতের সারাংশ	

চতুর্থ খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট ১৯ - কার্যবাহ	

পঞ্চম খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট-২২- রাজনৈতিক দলের নিকট হতে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে প্রাপ্ত বিস্তারিত সুপারিশ	

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সংস্কার'–এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।"

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তাই এই

সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিল। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের

৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই-মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

কমিশনের সুপারিশসমূহের সার-সংক্ষেপ

সংবিধান সংস্কার কমিশন একটি কার্যকর গণতন্ত্র, মৌলিক মানবধিকার সুনিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাতটি প্রধান বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ করছে:

১. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান আদর্শ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনস্বরূপ সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে "সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র" প্রস্তাব

২. ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

৩. প্রধানমন্ত্রী পদের একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস

৪. অন্তর্বর্তী সরকার কাঠামোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

৫. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ

৬. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সুনিশ্চিতকরণ

৭. মৌলিক অধিকারের আওতা সম্প্রসারণ, সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ।

প্রস্তাবনা

সংবিধানের বিদ্যমান প্রস্তাবনাকে নিম্নোক্ত ভাষ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে-

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, যারা এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি;

আমরা সকল শহীদের প্রাণোৎসর্গকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অঙ্গীকার করছি যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের যে আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার যে আদর্শ ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিল, সেই সকল মহান আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে;

আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করছি, যে সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এবং যে সংবিধান স্বাধীন সত্তায় যৌথ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ করবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার চেতনায় সংঘবদ্ধ করবে, সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখবে;

জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।

নাগরিকতন্ত্র

১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো থাকছে।

২. **ভাষা:** নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

৩. **নাগরিকত্ব:** 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...' কমিশন এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হোক—"বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন"।

৪. **সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা:** কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে।

৫. **সংবিধানের মূলনীতি**

৫.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৫.২ বাংলাদেশের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সুতরাং, কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে - "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"।

রাষ্ট্রের মূলনীতি

কমিশন সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়ার সুপারিশ করছে।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

১. কমিশন সংবিধানের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করছে। বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক সনদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ও নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর করবে।

২. সংবিধানে কিছু নতুন অধিকার যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্য পাওয়া, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অধিকার খর্বের ঝুঁকি কমাবে।

৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি সরকারের জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

আইনসভা

কমিশন ৫০৫ (পাঁচশত পাঁচ) সদস্যের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভার প্রস্তাব করছে; একটি নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং একটি উচ্চকক্ষ (সিনেট)। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

নিম্নকক্ষ

১। নিম্নকক্ষ গঠিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে। ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ (একশ) জন নারী সদস্য সারা দেশের সকল জেলা থেকে এই মর্মে নির্ধারিত ১০০ (একশ)টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে।

৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা হবে।

৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন।

৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান।

৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যদের তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

উচ্চকক্ষ

১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশ পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে; এর মধ্যে ১০০ (একশ) জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation-PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের মনোনয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১০০ (একশ) জন প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে।

এই ১০০ (একশ) জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে। অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য ও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন) প্রার্থী মনোনীত করবেন।

২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে।

৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত উচ্চকক্ষের অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

সংবিধান সংশোধনী

সংবিধানের যেকোনো সংশোধনীতে উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে, এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে।

অভিশংসন

রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধ্যমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

নির্বাহী বিভাগ

১। কমিশন সুপারিশ করছে যে আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

২। কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা সুপারিশ করছে; এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।

৩। কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (“এনসিসি”) গঠনের সুপারিশ করছে।

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল “এনসিসি” রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-র সদস্য হবেন: (অ) রাষ্ট্রপতি; (আ) প্রধানমন্ত্রী; (ই) বিরোধীদলীয় নেতা; (ঈ) নিম্নকক্ষের স্পিকার; (উ) উচ্চকক্ষের স্পিকার; (ঊ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; (ঋ) বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; (এ) বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; (ঐ) প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য।

উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। আইনসভা না থাকাকালীন এনসিসির যারা সদস্য হবেন (অ) রাষ্ট্রপতি; (আ) প্রধান উপদেষ্টা; (ই) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; (ঈ) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের ২ (দুই) জন সদস্য।

৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: (অ) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (আ) অ্যাটর্নি জেনারেল; (ই) সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (ঈ) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (উ) মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; (ঊ) প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার; (ঋ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান; (এ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।

রাষ্ট্রপতি

১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে – (অ) আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; (আ) প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' থাকলে ৬৪ টি ভোট]; (ই) প্রতিটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট।

৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

প্রধানমন্ত্রী

১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোনো সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জন করতে পারছেন না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।

৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনোভাবেই প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্যে এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

অন্তর্বর্তী সরকার

১। কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করছে।

২। এই সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।

৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে, তবে যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

৪। **প্রধান উপদেষ্টা** কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে-

৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্ট

১। কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।

২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠন করা হবে। এর সদস্যরা হবেন: (অ) প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান); (আ) আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য); (ই) হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); (ঈ) অ্যাটর্নি জেনারেল এবং (উ) একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।

৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারীর পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছে।

৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।

৬। কমিশন বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের সুপারিশ করছে।

'অধস্তন আদালত'

৭। কমিশন 'অধস্তন আদালত'–এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে।

৭.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

স্থানীয় সরকার

১. কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ

না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

২. কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে । যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৩. এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লিখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দিবে।

৪. কমিশন প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন: (অ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; (আ) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; (ই) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।

৫ কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

৬. সংস্কার কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

কমিশন সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করছে।

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

সিআরসি (CRC) নিম্নলিখিত পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরির জন্য সুপারিশ করছে, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে: এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন; (খ) নির্বাচন কমিশন; (গ) সরকারি কর্ম কমিশন; (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন; (ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন।

সিআরসি সুপারিশ করছে যে, সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

বিবিধ

১। কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তির সুপারিশ করছে, এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখার সুপারিশ করছে।

২। **জরুরী অবস্থার বিধানাবলী** কমিশন সুপারিশ করছে যে, কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। কমিশন মনে করে, জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই কমিশন অনুচ্ছেদ ১৪১খ ও অনুচ্ছেদ ১৪১গ বাতিলের সুপারিশ করছে।

প্রথম অধ্যায়

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা

জনগণের রাজনৈতিক-সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস

মুক্তিসংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এদেশের মানুষ অনেক লড়াইয়ে জয়ী হয়েছে। তথাপি, একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনাগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো বাস্তব রূপ লাভ করেনি। দক্ষিণ এশিয়ায় আমরাই একমাত্র রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী, যারা গত শতকে দুইবার স্বাধীনতা অর্জন করেছি, ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সালে। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল, নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা কায়েমের জন্য ১৯৭১ সালে আমাদের জনযুদ্ধের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। রক্তস্নাত স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হয়েও গণক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ২০২৪-এ সংগঠিত ছাত্র-জনতার বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থান জাতীয় জীবনে আবারও এক অসামান্য সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের এই বিশেষ মুহূর্তে আমাদের সামনে অত্যাবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি কল্যাণকর রূপকল্প অন্বেষণ এবং সমষ্টিগত জীবনে তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সক্ষম একটি সাংবিধানিক কাঠামো খুঁজে বের করা।

গণক্ষমতার সাংবিধানিক কাঠামো অনুসন্ধান এবং সেই লক্ষ্যে সুপারিশ তৈরির পটভূমি হিসেবে এই অধ্যায়ে সংবিধানের রাজনৈতিক এবং আইনি প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনা দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে এই জনপদের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে তা আলোচিত হয়েছে। একইসাথে এই ঐতিহাসিক ধারবাহিকতায় ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তার প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং তারপর থেকে গত ৫২ বছরে সংবিধানের বিধি-বিধানগুলোর চিহ্নিত দুর্বলতাগুলোর পর্যালোচনাও করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যমান সংবিধানের আইনি ও বিধানিক দিকগুলো এবং তার পর্যালোচনা, বিশেষ করে গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, জবাবদিহিতার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকরণ রোধে তা কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ক. জনগণ ও গাঠনিক ক্ষমতা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে এই জনগোষ্ঠী নিজেদের আত্মমর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীন সত্তায় বিকশিত হবার লড়াই অব্যাহত রেখেছে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা মূলত একটি 'গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা' এবং সমষ্টিগত জীবনের জন্য রূপকল্প খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। লাহোর প্রস্তাবে যেই অভিব্যাক্তির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে আমাদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্রসত্তা গঠনের প্রস্তাব ছিল[১]।

জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উপলব্ধিই হলো তার রাজনৈতিক সত্তার ভিত্তি—সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে কাম্য সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করতে নিজেদের সম্মতিতে একত্রিত হওয়া। নিজেরা রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়া এবং নিজেদের সরকার গঠন করবার যুগপৎ প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় গাঠনিক ক্ষমতার (কন্সটিটুয়েন্ট পাওয়ার) প্রয়োগ। জনগণ যদি কখনো নিজেদের সরকার নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা কার্যকর করতে অপারগ হয়, তখন অবশ্যম্ভাবীভাবেই গাঠনিক ক্ষমতাকে পুনরায় বিশুদ্ধ এখতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করতে হয়। এটা জনগণের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাধিত হয়। এ পর্যায়ে 'জনগণ' নামক একটি সামষ্টিক কর্তাসত্তার উদ্বোধন ঘটে[২]। এই সামষ্টিকতার অন্তর্গত একটা দিক হল কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং আইনের নতুন বৈধতা নির্মাণ। অপরটি হল সমবায়িক জীবনের রূপটি কী হবে তা নিজেরা সম্মিলিতভাবে ঠিক করা—যার অভিব্যক্তি ঘটে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সাথে তাদের নিজেদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

[১] আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬৫, প্রথমা প্রকাশনী ২০১৭, ঢাকা।

[২] Alain Badiou, Pierre Bourdieu, Judith Butler, et. al., *What is a People?*, Columbia University Press, 2016, New York.

গাঠনিক ক্ষমতা পরিভাষাটি ল্যাটিন ভাষার কন্সটিটিউরে শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ হলো কারো সাথে বা সহযোগে কোনো কিছু গড়া, তোলা, নির্মাণ, স্থাপন, তৈরি বা প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ এইসব অর্থে, কোনো কিছুর উপস্থিতির কারণ হওয়া। অন্যের সহযোগে, সংগঠিতভাবে, পরস্পরে মিলে পাবলিকলি তথা রাজনৈতিক পরিসরে যখন কোনো কিছু নির্মাণ বা প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন সে ঘটনায় নতুন কিছুর প্রবর্তন বা পুনপ্রবর্তন ঘটে। প্রবর্তনের এই ক্ষমতা জনগণের এমন এক চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, যা একইসাথে সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্ত করা কিংবা স্বৈরশাসকের অপসারণ ক্ষমতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। সমষ্টির গণক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত এই ক্ষমতা সমষ্টির সংঘবদ্ধতা থেকে তৈরি হয়। এই ক্ষমতার মাধ্যমে তৈরি হয় নতুন সরকার, সরকারের রূপ, নিয়োগের ধরন এবং পরিচালনার পদ্ধতি। জনগণই এই ক্ষমতার বৈধতার নির্ধারক এবং নিরূপক।

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। জনগণের গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে তার সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের কারণে, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সব ব্যর্থতাই সমান নয়, কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও হয়েছে।

এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক মুহূর্ত। গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার এই দীর্ঘ লড়াইয়ে আরেকটি মাইলফলক অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৭১ সালের গাঠনিক মুহূর্তও বেহাত হয়েছে। আমরা গণক্ষমতায় অভিষিক্ত রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করতে পারিনি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে গণক্ষমতাকে পাকাপোক্ত না করে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোকেই অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ তার বাইরের অধীনস্থ অংশ। ফলে তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় শাসিত জনগোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু জনগণের ইচ্ছা এবং কর্তৃত্বে সরকার পরিচালিত হয় না, তাই জনগণকে প্রতিপক্ষ গণ্য করে একটি বিস্তৃত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চরিত্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের অভিজ্ঞতায় তেমন একটি রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ভারতের শাসনকাঠামো এমনভাবে গঠিত হয়েছিল যেখানে জনগণ ছিল আলাদা সত্তা। যে বিস্তৃত প্রশাসনিক কলকব্জার মাধ্যমে উপমহাদেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল তা হচ্ছে ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র[৩]।

প্রথমদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাজের সরকার স্থানীয় জনগণের নামমাত্র অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণক্ষমতার উন্মেষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। পাকিস্তান আমলেও (১৯৪৭-১৯৭১) ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনির্মাণ এবং গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে গণক্ষমতার গঠন সম্পন্ন করা যায়নি। ফলে জনগণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই আটকা পড়েছে।

খ. প্রজা থেকে নাগরিক: ঔপনিবেশিক যুগে জনগণ

ব্রিটিশ শাসনামলে জনগণের নাগরিক সত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে এই জনগোষ্ঠী স্ব-শাসনের জন্য অযোগ্য। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা শুধু নৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক ঘাটতি হিসেবে বোঝানো হয়নি, বরং এই ঘাটতি ব্রিটিশ শাসনের বৈধতার যুক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই, ঔপনিবেশিক শাসনকে অতিক্রম করা এবং সার্বভৌম হওয়ার জন্য 'উপযুক্ত' জনগণ তৈরি করা ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের লক্ষ্য[৪]। যদিও বৃটিশ প্রশাসনিক রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হয়েছিল, তবু কখনোই জনগণকে সার্বভৌম নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের আন্দোলন ছিল অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি।

কোম্পানি আমল (১৭৫৭–১৮৫৭)

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা। ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থায় প্রশাসনিক কার্যক্রমের পরিসর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় এবং এটি এক বিশাল প্রশাসনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের শাসনের মাধ্যমে এই প্রশাসনিক রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী এবং স্থায়ী করা হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ সালের ভারত সরকার আইন (Government of India Act)-এর মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। কোম্পানি তার সমস্ত ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং

[৩] Abdur Razzaq, *Political Parties in India,* pp. 25-31, 146-178, The University Press Limited, 2022, Dhaka.

[৪] Nazmul Sultan, *Waiting for the People: The Idea of Democracy in Indian Anticolonial Thought*, Harvad University Press, 2024, London.

চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা ব্রিটিশ রাজের কাছে হস্তান্তর করে। এই আইনের মাধ্যমেই সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংবিধানিক ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তিতে রাজা/রানীকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও প্রেসিডেন্সি টাউনগুলোর গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ তখন ছিল না।

বৃটিশ রাজের সময়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব (১৮৫৮–১৯৪৭)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বৃটিশ রাজের ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের প্রকাশ এবং গণসার্বভৌমত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে অধিকতর কাঠামোবদ্ধ এক ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সূচনা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় তদারকির সূচনা এবং প্রশাসনিক সম্প্রসারণের ফলে শাসন ব্যবস্থার উচ্চস্তরে কিছু ভারতীয় অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের মাধ্যমে আইনসভায় উপমহাদেশের জনগণের মধ্য থেকে সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি হয়, যেটাকে আইনসভায় নামমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বের সূচনা বলা যেতে পারে। তবে খুবই সীমিত ক্ষমতার কারণে এই অন্তর্ভুক্তি শাসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেয়ে উপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত করার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসাবে বেশী কাজে দিয়েছিল।

১৮৯২ সালে বৃটিশ সরকার ভারতীয় কাউন্সিল আইন করে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় কিছু নন-অফিসিয়াল সদস্যের মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধি হওয়ার নীতি প্রবর্তন করে। এই আইন অনুসারে আইনসভায় তিন ধরনের সদস্য ছিল: নির্বাচিত, কর্মকর্তা এবং মনোনীত নন-অফিসিয়াল সদস্য। এই প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জনগণের সাংবিধানিক ক্ষমতার স্বীকৃতি ছিল না; বরং তা প্রশাসনিক রাষ্ট্রের এক সমন্বয়মূলক পদক্ষেপ ছিল।

এরপর ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের উপাদান প্রবর্তনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। তবে এই নীতিও ছিল নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতির পরিবর্তে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণকে অন্তর্ভুক্তির কৌশল। তখনো আইনসভার বেশিরভাগ আসন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তদের দ্বারা পূর্ণ করা হতো।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন (ডায়ার্কি) প্রবর্তন করে, যেখানে উপমহাদেশের জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পান। এখানে যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের আংশিক প্রতিনিধিত্ব ছিল, তবে শাসনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র তখনো প্রাধান্য পায়নি।

তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলন করা হয়। আপাত প্রতিনিধিত্বশীল মনে হলেও ১৯৩৫ সালের আইনটি এমন একটি ফেডারেল শাসন কাঠামো তৈরি করে, যা ব্রিটিশ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই ঔপনিবেশিক সংবিধান জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনের বিধান করে, তবে তা রাখা হয় ব্রিটিশদের নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে। গভর্নরদের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ছিল অবারিত[৫]। দুঃখজনকভাবে, পাকিস্তান আমলেও একই শাসন কাঠামো বহাল ছিল। এই প্রশাসনিক কাঠামো জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতার জন্য একটি বড় হুমকি তৈরি করে। ফলে গণতন্ত্রের প্রাধান্য তো দূরের কথা, পাকিস্তান ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তার প্রথম সাধারণ নির্বাচনও আয়োজন করতে পারেনি।

গাঠনিক মুহূর্তসমূহ

যদিও বৃটিশদের প্রশাসনিক রাষ্ট্রকাঠামো জনগণের গাঠনিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে। তবু এ দেশের মানুষ তার গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম জারি রেখেছে। যাতে রাষ্ট্রের গাঠনিক কর্তা হিসেবে জনগণের আবির্ভূত হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়।

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল এমন একটি ঘটনা। দখলদার বৃটিশ কম্পানির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগ দেন সন্ন্যাসী, কৃষক, জমিদার এবং বাংলার অভিজাতগণ। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পাশাপাশি উপমহাদেশের পরবর্তী আন্দোলনের ভিত্তিও স্থাপন করে দেয় এই বিদ্রোহ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শুরু হওয়া ফরায়েজি আন্দোলনও তেমন আরেকটি গাঠনিক প্রচেষ্টার নমুনা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের কর্তাশক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। সমসাময়িক প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বাঙালিদের ঔপনিবেশিক

[৫] Elangovan, A., 'Provincial Autonomy, Sir Benegal Narsing Rau, and an Improbable Imagination of Constitutionalism in India 1935–38', *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 36(1), 2016, 66–82.

দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মানসিক এবং শারীরিক সক্ষমতা ছিলনা। এমন ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে এই আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানরা উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি প্রদর্শন করে[৬]। এই আত্মশক্তি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কার্যকর চ্যালেঞ্জ জানাতে কৃষকদের সক্ষম করে তোলে। রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা তথা জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার অভিপ্রায় প্রকাশের এক ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল এই আন্দোলন।

বৃটিশ শাসনামলে সবচেয়ে জোরালো প্রতিরোধের ঘটনা ছিল সিপাহি বিপ্লব। বৃটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত এই বিপ্লব ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সংঘটিত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লব। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হিসেবে চিহ্নিত এই বিপ্লবের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং ব্রিটিশ রাজ প্রত্যক্ষ শাসন শুরু করে। প্রধানত বেঙ্গল আর্মির সৈনিকদের মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এই বিপ্লব ছিল বাংলায় গাঠনিক শক্তি হিসেবে জনগণের উদ্ভবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

যদিও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করা হয়েছিল, তবু বাংলার মুসলমানরা এটিকে তাদের অনুকূল একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছিল। এটি জনগণের ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থের সংমিশ্রণের একটি মুহূর্ত হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ ছিল প্রশাসনিক রাষ্ট্র কাঠামোকে বিস্তৃত করার একটি পদক্ষেপ; গণসার্বভৌমত্বের সাথে এর সংযোগ ছিল না। বৃটিশ আমলের এসব গাঠনিক মুহূর্তের মধ্যে সুস্পষ্ট অভিপ্রায় হিসেবে আবির্ভূত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।

লাহোর প্রস্তাব

বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় লাহোর প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনাই কার্যকর করা যাবে না এবং মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না এটি এই মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যে ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত অঞ্চলগুলো এমনভাবে গঠিত হবে, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে রাষ্ট্র নির্মাণের ঘোষণা দ্বারা এই প্রস্তাব সংকুচিত ছিল না, বরং সুস্পষ্ট সাংবিধানিক নীতি হিসেবে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখারও প্রস্তাব ছিল। এই প্রস্তাব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবোধ তৈরি করে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকে জোরালো করে তোলে[৭]।

গ. ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর ধারাবাহিকতা: পাকিস্তান পর্ব

১৯৪৭ ছিল প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক মুহূর্ত। তবে এই মুহূর্তটি গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সাংবিধানিকভাবে রূপান্তরিত হয়নি। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার অভিষেক বারবার বিফল করে দেয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের ধারা অব্যাহত থাকার কারণে গণক্ষমতার বাস্তবায়ন হয়নি। রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি।

আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই মুসলিম লীগের অদূরদর্শিতা এবং ভুল নীতিকে দোষারোপ করেন। মুসলিম লীগের জনমুখী কর্মীরা হতাশ হন। তাদের হতাশা আরও বেড়ে যায়, কারণ মুসলিম লীগ সরকার জাতীয় ও প্রাদেশিক নিয়োগে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে[৮]। এছাড়াও পুরো কাঠামো ছিল ঔপনিবেশিক সংবিধানের ধারাবাহিকতা, যা প্রশাসনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান আমলে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ছিল জনগণের গাঠনিক ক্ষমতা প্রকাশের আন্দোলন।

গণসার্বভৌমত্ব ও পাকিস্তান পর্বের অভিজ্ঞতা

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীন হবার পর এর শাসন কাঠামো পরিচালিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী। উপনিবেশিক এই শাসন কাঠামো যে গণসার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং গঠনের জন্য অনুপযুক্ত তা সুস্পষ্টভাবে লাহোর প্রস্তাবের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল।

---

[৬] Iftekhar Iqbal, The Bengal Delta. Ecology, State and Social Change, 1840-1943, pp.67-92, Palgrave Macmillan, New York 2010.

[৭] মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২, ঢাকা।

[৮] Talukder Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution and Its Aftermath, The University Press Limited, 1988, Dhaka.

দুইটি পৃথক রাষ্ট্র তৈরির সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার আগেই সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটি গণপরিষদ (constituent assembly) গঠন করা হয়। ১৯৪৬ এর মাঝামাঝি গঠিত হওয়া এই পরিষদ ডিসেম্বরে প্রথম অধিবেশনে বসে। মুসলিম লীগ এই পরিষদে শুরুতে অংশ নিলেও পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তা বর্জন করেন[৯]। ১৯৪৭-এর ভারত স্বাধীনতা আইনের অধীনে পাকিস্তান আর ভারত আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি হওয়ার পর স্পষ্টতই পূর্ববাংলাসহ পাকিস্তানের জন্য আলাদা গণপরিষদ (constituent assembly) তৈরি হয়। সাথে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কাজ করে।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদে বিষয়গত প্রস্তাব (নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত) বা অবজেক্টিভ রেজুলিউশন গৃহীত হয়। এর মৌলিক নীতিমালা ছিল যে, "রাষ্ট্র তার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে; গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সুবিচারসহ ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার ও পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং নিজ নিজ সংস্কৃতি পালন করতে পারবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে নির্দেশিত সীমাবদ্ধতাসহ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি ইউনিট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে ফেডারেল কাঠামোর অধীনে অবস্থান করবে।"

বিষয়গত প্রস্তাবে গৃহীত মৌলিক নীতিমালা অনুসারে সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির একটি সংমিশ্রণ প্রস্তাব করে যাতে রাষ্ট্রপতির হাতে সবচেয়ে বেশিই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। প্রদেশগুলোর জন্য কার্যকর কোনো স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয় না। জরুরি অবস্থা জারি ও সংবিধান স্থগিত রাখার ক্ষমতা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশগুলো ছিল সবচাইতে বেশি অগ্রহণযোগ্য।

কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। মূলনীতি কমিটির সুপারিশমালা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়[১০]।

এই সময়কাল এখনো সজীব, বিশেষত পরবর্তী ঘটনাসমূহের কারণে। শাসন কাঠামো এবং রাষ্ট্র গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর দ্বন্দ্বই এই সময়ে স্পষ্টত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বিপরীতে, ১৯৪৭-এর গাঠনিক মুহূর্তের প্রভাবে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র থেকে বের হওয়ার চেষ্টা হিসেবে একটি গণপরিষদ তৈরি করা হয়, যা একইসাথে আইনপরিষদ হিসেবেও কার্যকর ছিল। সেই পরিষদে গভর্নরের শাসন থেকে বের হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ ক্রিয়াশীল হচ্ছিল। কিন্তু তৎকালীন গণপরিষদ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বা প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল না। সরাসরি জনগণের গাঠনিক ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করতে না পারায় তা ব্যর্থ হয়েছিল।

পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের আগে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আমরা জনগণের ক্ষমতার আভাস পাই ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে, যাতে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় এবং মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মৃত্যুর সূচনা ঘটে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর আইয়ুব খান সামরিক শাসনকে গণতন্ত্রের তকমা পরানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে হ্যাঁ/না ভোট আয়োজন করে নিজের ক্ষমতার এক ধরনের বৈধতা তৈরির চেষ্টা করেন। এরপর ১৯৬২-তে বেসিক ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন আয়োজন করেন। আইয়ুব খানের পাঁচ বছর মেয়াদান্তে নিজের মেয়াদ আরো বাড়ানোর জন্য ১৯৬৫ সালে বেসিক ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন আয়োজিত হয়। এতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার বিজয় ও আধিপত্য নিশ্চিত করেন।

মোট তিনটি সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে এইসময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ১৯৫৬ সালের স্বল্পস্থায়ী সংবিধান, এবং ১৯৬২ সালের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সংবিধান। জনগণের গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এইসব সাংবিধানিক ও গাঠনিক প্রচেষ্টার রূপ কেমন ছিল সেটা উপলব্ধি করা দরকার।

পাকিস্তান ১৯৪৭ - ১৯৫৮

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রধানত ঔপনিবেশিক সময়ের আইনি সাংবিধানিক কাঠামো কার্যকর ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৭ এর গাঠনিক মুহূর্তকে কাজে লাগানো হয়নি, বরং গণসার্বভৌমত্ব বিরোধী শাসনকাঠামো ব্যবহার করে জনগণের গাঠনিক ক্ষমতাকে পরাস্ত করা হয়।

গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনে বসে ১৯৪৭ সালের ১০ই আগস্ট। প্রথম গণপরিষদ একইসাথে আইনসভা হিসেবেও আইন প্রণয়নের কাজ করে। গণপরিষদে জিন্নাহ তাঁর ভাষণে বলেন যে 'আপনারা একটি সার্বভৌম আইনসভা, আপনাদের সকল ধরনের

[৯] Sadaf Aziz & Moeen Cheema, 'From Nation to State: Constitutional Founding in Pakistan', *In Constitutional foundings in South Asia*, edited by Kevin YL Tan and Ridwanul Hoque, Hart Publishing, 2021.

[১০] মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২, ঢাকা।

ক্ষমতা এখন আছে'। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এর ধারা ৯ ব্যবহার করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্নমেন্টদের হাত থেকে গভর্নর জেনারেলের (নিজের) হাতে নিয়ে নেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তখনকার ব্রিটিশ প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এর ফলে গণপরিষদের যে ক্ষমতা তা গভর্নর জেনারেলের অধীনস্থ হয়ে পড়ে[১১]।

ভারত শাসন আইনের অধীন উক্ত শাসন কাঠামোতে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাহী বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যদিও ১৯৪৭ সাল থেকে গণপরিষদ একইসাথে আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করেছে এবং প্রায় ৪৪টি আইন তৈরি হয়েছিল সেই পরিষদে, তথাপি আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও চূড়ান্ত বিচারে গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত ছিল না। ঔপনিবেশিক সামরিক বাহিনী আর গভর্নর জেনারেল কেন্দ্রিক সে প্রশাসনিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার কাঠামো কতটা স্বৈরাচারী এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক ছিল তার নমুনা হচ্ছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, পশ্চিম পাকিস্তানে (পাঞ্জাবে) কাদিয়ানি ইস্যুতে দাঙ্গা এবং লাহোরে সামরিক শাসন জারিকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের নির্দেশ এবং তা মানতে রাজি না হওয়ায় বরখাস্ত করার ঘটনা[১২]।

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গণপরিষদ ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম পাকিস্তান সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে। জি ডব্লিউ চৌধুরীর মতে রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে—ধর্ম প্রশ্নে সেই বিষয়টির সুরাহা করতে না পারা পাকিস্তানের সংবিধান তৈরিতে বিলম্ব ঘটিয়েছে[১৩]। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সংবিধান তৈরি বিলম্বিত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের যথাযথ উপায় খুঁজে না পাওয়ার সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব গণপরিষদে এসেছে কিন্তু কোনোটাই পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রতিনিধিত্বশীলতার দাবি পূরণ করেনি। এই সমস্যার সমাধান হয় পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী ফর্মুলার মাধ্যমে। মোহাম্মদ আলী ফর্মুলাতে উচ্চকক্ষের ৫০টি আসনের মধ্যে ৫টি প্রদেশের প্রত্যেকটির জন্য দশটি করে আসন প্রস্তাব করা হয় এবং নিম্নকক্ষের মোট ৩০০ আসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টনের প্রস্তাব করা হয়। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের আসন সংখ্যা ছিল ১৬৫; উচ্চকক্ষসহ মোট আসন দাঁড়ায় ১৭৫। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশ মিলে মোট আসন ছিল ১৬৫। এর ফলে উচ্চকক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান আর নিম্নকক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থান তৈরি হয়।

এছাড়াও ফেডারেল গভর্মেন্ট এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে যে প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সরকারের এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন বিদ্যমান ছিল। সংবিধান সভায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ালো যে, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার হবে, নাকি স্বায়ত্তশাসনকে আরো বেশি প্রসারিত করে একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার রাখা হবে। ফলে ব্রিটিশ আমল থেকে এখানে ক্রমান্বয়ে জনগণের কর্তাসত্তার যেই উন্মেষ ঘটছিল তাকে আশ্রয় করে জনগণের গণসার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়টির সমাধান করা ছাড়া রাষ্ট্র গঠন রীতিমত অসম্ভব একটি প্রচেষ্টার নামান্তর হয়ে পড়ে।

১৯৫৪-এর ২১ দফা কিংবা ৬৬-এর ছয় দফা দেখলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, এইসব দাবিদাওয়ার অন্যতম মূলকথা হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের ব্যর্থতা শুধু দুই অংশের মধ্যে ঐক্য কিংবা অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার ব্যর্থতা নয়, একই সাথে গণসার্বভৌমত্বের প্রশ্নে পাকিস্তানকে একক রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে গঠন করবারও ব্যর্থতা। এমন প্রস্তাবও এসেছিল যে যেহেতু দুই পাকিস্তানের মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য নেই বরং বিস্তর দূরত্ব, কাজেই এখানে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর কিংবা সফল ফেডারেল রাষ্ট্র তৈরি করা সম্ভব হবে না। কাজেই রাষ্ট্রকে জাতীয়ভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশি শক্তিশালী করতে হবে।

কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণের জন্য পাকিস্তানে যে সংবিধানিক সমাধান অনুসরণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, উভয়ের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে এর বাইরে যে ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (গভর্নর বা প্রেসিডেন্ট) যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ—ফেডারেল কিংবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে পারবেন। প্রধানত একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৪৭-এর গণপরিষদের তাদের প্রস্তাবিত সংবিধান ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে ঘোষণা করার কথা ছিল। সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া ২৭ অক্টোবর সংবিধান ড্রাফটিং কমিটির মাধ্যমে গণপরিষদে পেশ করা হবে এবং ২৫

[১১] Sadaf Aziz & Moeen Cheema, 'From Nation to State: Constitutional Founding in Pakistan', *In Constitutional foundings in South Asia*, edited by Kevin YL Tan and Ridwanul Hoque, Hart Publishing, 2021.

[১২] Hamid Khan, *Constitutional and Political History of Pakistan*, Oxford University Press, 2001.

[১৩] Choudhury, G. W., `Constitution-Making Dilemmas in Pakistan', *The Western Political Quarterly* (1955), 8(4), 589–600.

অক্টোবর ড্রাফটিং কমিটি তাতে সাক্ষর করবে—এমন পরিকল্পনা ছিল। তার আগেই ২৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন।

১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদ ভারত শাসন (৫ম সংশোধনী) আইনের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৯, ১০, ১০-ক, ১০-খ ধারা সংশোধন করেন। এর মাধ্যমে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ, গণপরিষদের নিকট মন্ত্রিপরিষদের সামষ্টিক জবাবদিহি এবং কোনো একজনের বিরুদ্ধে অনাস্থা আসলে সকলের পদত্যাগ, প্রধানমন্ত্রীর যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করার ক্ষমতা, এবং গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে কাজ করার নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক এসব নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে গণপরিষদকেই ভেঙে দেয়া হয়। যদিও গণপরিষদের এই সংশোধনীকে জি ডব্লিউ চৌধুরী সাংবিধানিক ক্যু বলেছেন, তবু এসব বিধান ছিল গণতন্ত্রায়নের জন্য সহায়ক[১৪]।

তবে এ কথাও উপেক্ষা করার উপায় নেই যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। অনেক ক্ষেত্রে দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে তারা সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে আঁতাত করেছেন। গণসার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে তারা নিজেরাও অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকের মতোই আচরণ করেছেন। এর সবচেয়ে করুণ নমুনা ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত সময়টুকু।

১৯৫৬-এর ২৩ মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৫৮-এর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কিছুটা সক্রিয় ছিল, যদিও তা পুরোপুরি কার্যকর হবার আগেই সামরিক শাসন জারি করা হয়। সংবিধানে গভর্নর হিসেবে অনুমোদন দিয়ে সংবিধানকে চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে সম্মতির বিষয়টিকে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হওয়ার একটি দরকষাকষির বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৯৫৪-এর মার্চ থেকে ১৯৫৮-এর সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে সাতটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, এমনি এক অস্থির অবস্থার মধ্যে চলছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭০-এর আগে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে সরাসরি জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়নি। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সেনাবাহিনী, প্রশাসন, বিচারবিভাগ সবকিছু গণক্ষমতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে।

বিচারবিভাগ গণবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল মৌলবী তমিজুদ্দিন খান বনাম পাকিস্তান মামলায়, যেখানে চিফ জাস্টিস মুনীর রায় দিয়েছিলেন যে গভর্নরের গণপরিষদ বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে। পরবর্তীতে আবার তিনিই রেফারেন্সের ভিত্তিতে গণপরিষদ পুনর্গঠনের মত দেন। গণপরিষদ পুনরায় পূর্বের খসড়ার ভিত্তিতে কাজ করে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও গণসার্বভৌমত্বের পক্ষে একটি দুর্বল গণপরিষদ চলেছিল, এবং সেই অস্তিত্বহীন সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল।

পাকিস্তান ১৯৫৮–১৯৭০

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করার পর ১৯৫৯ সালে বেসিক ডেমোক্রেসি অর্ডারের মাধ্যমে বুনিয়াদি গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। ১৯৬০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইয়ুব খান একটি সংবিধান কমিশন নিয়োগ করেন, যার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সংবিধান কার্যকর করেন। সম্ভবত তা আধুনিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে খুবই বিরল এক ঘটনা। এক ব্যক্তির দেয়া সেই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান শাসিত হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে একটি ছয় দফা ভিত্তিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ছয় দফায় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংবিধানের জন্য লাহোর প্রস্তাব এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করেন।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি অবধি পাকিস্তানে এক নজিরবিহীন গণআন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই আন্দোলনে প্রশাসনযন্ত্র পুরোপুরিভাবে অচল হয়ে পড়ে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১১ দফা ঘোষণা করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ১১ দফা কর্মসূচি সেই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১১ দফার দুই নাম্বার দাবি ছিল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

এই পটভূমিতে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে, ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে জাতিকে অভয় দিয়ে বলেন যে, দেশে একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের উপযোগী অনুকূল

[১৪] A B M Mafizul Islam Patwari, *Constitution and Fundamental Rights under the Martial Law in Pakistan 1958-1962*, Dhaka University Press, 1988.

পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া তার অন্য কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ 'আইন কাঠামো আদেশ' বা লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) ঘোষণা করা হয়, যাতে একটি প্রস্তাবনা, ২৭টি অনুচ্ছেদ, তিনটি তফসিল, পরিষদের কার্যবিবরণীসহ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নিয়মাবলী ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে, ১২ নভেম্বর এই জনপদের ইতিহাসে ভয়াবহতম এক প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যায়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যায়, অসংখ্য ঘরবাড়ি ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় অবহেলা ও জীবন রক্ষায় চরম উদাসীনতা প্রদর্শনের কারণে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর প্রতি গণঅসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেন মাওলানা ভাসানী। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, এখন আর স্বায়ত্তশাসন নয়, বাঙালি আজ থেকে তাদের স্বাধীনতা চায়। একই জনসভায় মাওলানা ঘোষণা করেন, 'আমি আর এই নির্বাচন মানিনা, এই নির্বাচন আমি বয়কট করছি।'

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারটি ছিল ছয় দফা ও ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক। ইশতেহারে আওয়ামী লীগ এমন একটি 'বাস্তব গণতন্ত্র' প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয় যেখানে 'জনগণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করবে এবং বিরাজ করবে সাম্য ও সুবিচার'। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়নের উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭ এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে তারা ২৯৮টি আসন লাভ করে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান গৃহীত হওয়ার বিধান থাকায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ নির্ধারক অবস্থানে চলে যায়।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের ৩০ সদস্যবিশিষ্ট সাংবিধানিক কমিটি ছয় এবং ১১ দফা কর্মসূচিভিত্তিক খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে। ২৩ মার্চ খসড়া সংবিধান ইয়াহিয়া খানের কাছে দাখিল করে। সেই খসড়া সংবিধান আর গণপরিষদের যৌথ অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। গোপনে ইয়াহিয়া খান একটি হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫ মার্চের রাতে ভয়ংকর গণহত্যায় মেতে উঠে।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে জনগণের গাঠনিক কর্তাসত্তার মহাকাব্যিক আবির্ভাব ঘটলেও রাষ্ট্রের দায়িত্বভার জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্র অনিহা দেখাতে থাকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর আমরা দেখি গণক্ষমতাকে গণহত্যার মাধ্যমে দমন করবার চেষ্টা চলে। ফলে একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রসত্তার আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবু ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপুল আত্মত্যাগের পর যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তা প্রক্রিয়া এবং বিষয়বস্তুর বিচারে গণসার্বভৌমত্বকে আশ্রয় করে গঠিত হয়নি। এমনকি একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের কাঠামো হিসেবেও তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

বাংলাদেশ কালপর্ব

সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে সদ্য স্বাধীন দেশের জন্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে সঙ্গতকারণেই এই বিষয়ে বহুমুখী আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্কের সূত্রপাত হয়। দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়া নিয়েই শুধু নয়, খসড়া সংবিধান এবং পরবর্তীতে গৃহীত চূড়ান্ত সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। বাংলাদেশের ৫২ বছরের যাত্রাপথে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি ও প্রণীত সংবিধানটির নানান অসঙ্গতি বারবার আলোচনায় এসেছে। বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনার সুবিধার্থে এই আলোচনাগুলোর প্রধান দিকগুলোকে নিচে তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে :

১. স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের নৈতিক বৈধতা কতখানি ছিল

২. গণপরিষদ আদৌ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল কি না

৩. প্রণীত সংবিধান বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া কী ছিল

এই তিনটি বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে শুধু সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি বা গণপরিষদের আইনি এখতিয়ারের প্রশ্নগুলো নয়, বরং বাংলাদেশে রাষ্ট্রগঠন বিষয়টিরই অনেকগুলো মৌলিক সঙ্কটের বীজ দেখা যাবে, যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে রাষ্ট্রের এমন চরিত্র দান করেছে যা জনগণকে বিপন্ন করে তুলেছে।

১. গণপরিষদের নৈতিক বৈধতা

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান যারা প্রণয়ন করেছিল, সেই গণপরিষদের নৈতিক বৈধতার সঙ্কটটি শুরু থেকে দৃশ্যমান ছিল। বাংলাদেশের সংবিধান কারা প্রণয়ন করবেন, তাদের বৈধতার উৎস কী, সেই প্রশ্নটি দেশ স্বাধীন হবার মাত্র অল্প কয়েকদিন পরই

উত্থাপন করা হয় আওয়ামী লীগের অন্যতম মিত্র সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ন্যাপ (মোজাফফর) এর একটি সংবাদ সম্মেলনে। ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখের ওই সংবাদ সম্মেলনে "সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান" গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

ওই সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর পর্বে ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমেদ বৈধতার গুরুতর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, "আর একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে দেশের জন্য কোনো স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ করা যায় না।" কারণ হিসেবে তাঁদের দলের উপলব্ধির কথা বলেন তিনি: "স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দেশ একটি গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, ফলে এই পরিস্থিতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে জনগণের মতামত বিবেচনায় নিতে হলে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অপরিহার্য।"[১৫]

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের এই বক্তব্যটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। প্রত্যুত্তরে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সমাজসেবা সম্পাদক কে.এম ওবায়দুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে জনগণের পূর্ববর্তী ম্যান্ডেট অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেন: "জনগণের ইতিপূর্বে প্রদত্ত ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করা উচিত। নির্বাচিত প্রতিনিধি নহেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোনো সরকার দেশে গুরুতর আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণ হইতে পারে।" একইসাথে তিনি বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলে "তাতে দেশবাসী বিভ্রান্ত হবেন" বলেও মত প্রকাশ করেন।[১৬]

এই বিতর্কটি এখানেই থেমে থাকেনি, ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সংবাদ সম্মেলনেও প্রশ্নটি উঠেছিল। এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "মাত্র একবছর আগেই আমরা একটা নির্বাচন করেছি, এখনই কেউ নির্বাচন চাইলে যে আসনেই তারা চায় আমরা তাদের মোকাবেলা করতে রাজি আছি। অচিরেই কিছু উপনির্বাচন হবে, সেখানে তারা তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করতে পারেন। আমি নিশ্চিত যে তারা জামানত হারাবেন।"[১৭]

এভাবে 'মাত্র এক বছর আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত' হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে কার্যত স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে গোটা জাতির রাজনৈতিক চেতনার যে উল্লম্ফন ঘটেছিল, তাকে পাশ কাটানো হয়। কেননা, এখানে মূল প্রশ্নটি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে নির্বাচিত ওই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার আছে কি না, এবং এই পরিষদ জনগণের পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে কি না। নতুন সংবিধানে সেই পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার প্রতিফলনের জন্যই প্রয়োজন নতুন নির্বাচন, এটিই ছিল বিরোধীদের দাবি।

গণপরিষদ বিষয়ে আর একটি গুরুতর অভিযোগ এবং একটি বৈধতার সঙ্কটের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর তরফ থেকেও।

প্রথমত, জাসদের দাবি অনুযায়ী গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্য মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনার সাথে সম্পর্কহীন ছিলেন। ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দুই প্রাক্তন প্রভাবশালী ছাত্রলীগ নেতা আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ বলেন, "পরিষদ-সদস্যের শতকরা নব্বই জনই যেখানে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাথে যুক্ত না থেকে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময়টুকু ভারতে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করেছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার সেইসব গণপরিষদ-সদস্যের আদৌ আছে বলে দেশবাসী মনে করেন না।"[১৮]

একই বিবৃতিতে এই গণপরিষদে জনগণের একটা বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব নেই, এই দাবিও তারা উত্থাপন করেন। তারা যে প্রশ্ন তোলেন সেটা হলো "প্রায় ৫০ জনের অধিক গণপরিষদের সদস্যের (যারা দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত, অনুপস্থিত এবং পদত্যাগী) অবর্তমানে, অর্থাৎ বাংলাদেশের এক কোটির বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।"

উল্লেখ্য যে, সদ্য দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনটিতে 'শীঘ্রই কতকগুলি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার' প্রতিশ্রুতি দিলেও এবং সেখানে বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও এই উপনির্বাচনগুলো আদৌ আর আয়োজন করা হয়নি। অর্থাৎ, জাসদের দাবি মোতাবেক "বাংলাদেশের এক কোটির বেশি লোকের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের" কাজ শুরু ও সম্পন্ন হয়।

সংবিধান বিষয়ে তখনকার আরেকটি প্রভাবশালী দল মাওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-ও প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করেছিল। ন্যাপ ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করেছিল, সেই সময়ে শিক্ষার্থী-শ্রমিক ও কৃষকদের মাঝে দলটির জনসমর্থন ছিল।

[১৫] Muzaffar pleads for all party government, (অনূদিত) বাংলাদেশ অবজারভার, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

[১৬] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক ওবায়দুর রহমানের বিবৃতি, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

[১৭] Aid with strings will not be accepted (অনূদিত), বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭২।

[১৮] গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র চাই: বর্তমান গণপরিষদ শাসনতন্ত্র পাশের অধিকার হারিয়েছে, রব-সিরাজ; ৭ অক্টোবর, ১৯৭২, দৈনিক গণকণ্ঠ।

নির্বাচনের পথে না গিয়ে মাওলানা ভাসানী এবং সমমনা অনেকেরই রাজনৈতিক তৎপরতা বেশ আগে থেকেই স্বাধীন পূর্ববাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছিল এবং ২৩ নভেম্বর তারিখে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত উপকূলে ত্রাণ কাজে পাকিস্তানী শাসকদের অবহেলার প্রতিবাদে পল্টনের সমাবেশে মাওলানা ভাসানী "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দেন।[১৯] সরকারি বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বহু পত্রিকা এই সংবাদ প্রচার করেছিল। অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে বিলুপ্ত করে ভাসানী কেবল পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে সক্রিয় রেখেছিলেন।[২০] সে কারণেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন ও সংসদ গঠনের লক্ষ্যে ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে তার দল অংশগ্রহণ করেননি। ভাসানী ন্যাপ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থীগণকে নির্বাচন বর্জন করে রিলিফের কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দেয়[২১]। গোটা দেশ জুড়ে অজস্র জনসভা করে মাওলানা স্বাধীনতার এই দাবিটি ছড়িয়ে দেন, এবং ১৯৭১ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভাসানীর প্রতিটি সভায়ই উড়ানো হতো 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার পতাকা'।[২২]

শুধু ভাসানী একাই নির্বাচন বর্জন করেননি, "উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও পূর্বনির্ধারিত সময়ে নির্বাচনের কথা ইয়াহিয়া ঘোষণা করায় এবং 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক' নির্ধারিত মূলনীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে একথা বলায় এর প্রতিবাদস্বরূপ আতাউর রহমান খান" নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। আরও কিছু ব্যক্তি ও দল নির্বাচন থেকে সরে আসে।[২৩]

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত এই সদস্যদের নিয়ে তাই ভাসানী প্রশ্ন তোলেন। ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ প্রকাশিত ন্যাপের মুখপত্র সাপ্তাহিক হক-কথায় "সংবিধান প্রণয়ন করিবে কারা" শীর্ষক নিবন্ধে ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ী হওয়া ব্যক্তিদের স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।[২৪]

পরবর্তীতে হক-কথার ১৪ জুলাই সংখ্যাটিতে আরও স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে "গণপরিষদের আইনি ভিত্তি কোথায়" শীর্ষক নিবন্ধটিতে বলা হয়, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পাঁচ দফা শর্ত মেনে এই সদস্যরা নির্বাচনে গিয়েছিল। সেই নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল, তৎসহ নির্বাচিত হয়েছিল প্রাদেশিক পরিষদ।.... পাকিস্তান কায়েম থাকাকালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই দুই সময়ের ব্যবধান মাত্র ৯ মাস হলেও রাজনৈতিক সচেতনতা, আশা-আকাক্ষা ও মূল্যদানের দিক দিয়ে জনগণ অনেক এগিয়ে গেছে।[২৫]

এরপর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করা হলে মাওলানা ভাসানী ও তার রাজনৈতিক দল ন্যাপ সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে আবারও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন। ২০ অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বর্ণনা অনুযায়ী মাওলানা ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় আবারো বলেন, "বর্তমান গণপরিষদে ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সরকারের আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচিত সদস্যগণ ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট পাইয়াছিলেন। সুতরাং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তাহাদের কোনো অধিকার নাই।"[২৬]

ভাসানীর রাজনৈতিক বলয় থেকে শুরুতে আওয়ামী লীগের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে মৃদুস্বরে সমালোচনা করলেও এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করলেও দেশব্যাপী নিপীড়ন, ত্রাণসামগ্রী চুরি, সম্পত্তি দখল, দুর্নীতিসহ নানান অপরাধমূলক তৎপরতার অজস্র সংবাদ প্রচারিত হওয়া শুরু হলে অচিরেই গণপরিষদের এই সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের নৈতিক অধিকার বিষয়ক প্রশ্নটি জনমনেও গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

এভাবে, গণপরিষদের বৈধতার এই গুরুতর প্রশ্নটা উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি মহল থেকেই উঠেছিল। স্মরণ রাখা দরকার যে, ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় সংবিধানসভার সদস্য হিসেবে বৃটিশ আমলে অনুষ্ঠিত হওয়া শেষ নির্বাচনে বিজয়ীরাই দায়িত্ব পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই দুটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবিধান প্রণয়নের জন্যই জনগণ সেই নির্বাচনে তাদের ভোট দিয়েছিলেন। এ দেশ দুটিতে শাসকের পরিবর্তন কোনো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়নি, বরং ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা আইনি ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হয়েছিল। ফলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে 'আইনি অর্থে' বৈধতার অভাব তাদের ছিলনা, সেই প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য

[১৯] সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পৃ. ৩৬১; এছাড়া আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভাষণ ও বিবৃতি; সংকলন ও সম্পাদনা: ড. সাঈদ-উর রহমান, জাগৃতি প্রকাশনী, পৃ. ১১৭ দ্রষ্টব্য

[২০] ঐ, পৃ. ৩৭১

[২১] লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ (১৯৫৩-১৯৯৩); ইউপিএল পৃ. ১৭৫]

[২২] সৈয়দ আবুল মকসুদ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পৃ. ৩৮১

[২৩] লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ (১৯৫৩-১৯৯৩), ইউপিএল পৃ. ১৭৬

[২৪] সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র, ঘাস ফুল নদী, পৃ. ৫৬

[২৫] সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র, প্রকাশক ঘাস ফুল নদী, পৃ. ৪০৪

[২৬] খসড়া সংবিধান ও মতামত, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ অক্টোবর, ১৯৭২।

দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা বাংলাদেশে যুদ্ধকালীন চেতনাগত উত্তরণের সুবাদে সেই ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা সঙ্গতকারণেই ছিন্ন হওয়া ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

উল্লেখ্য যে, মস্কোপন্থী মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ একেবারে শুরুতেই এই বৈধতার প্রশ্নটি উত্থাপন করলেও পরবর্তীতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাদের প্রতিনিধি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি শেষ পর্যন্ত সংবিধানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি বলে গণপরিষদের একমাত্র সদস্য হিসেবে তাতে স্বাক্ষর প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

সংক্ষেপে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং মাওলানা ভাসানীর অনুসারী বলে পরিচিত প্রায় সকলে সম্মিলিতভাবে এই বৈধতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। এদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর আওতায় জনগণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগকে দিয়েছিল। কিন্ত এরপর মুক্তিযুদ্ধ হওয়ায় রাজনীতি, জনগণের আকাঙ্ক্ষা, রক্ষক্ষয়ী সংগ্রাম এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির যে গুণগত পরিবর্তন ঘটল, সেটিকে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত পাকিস্তানের সংবিধান পরিষদ ধারণ করতে পারে না। যেসব দল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়নি, কিন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি তুলেছিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাঁরা সংবিধান রচনার জন্যে জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে সময়ে অন্যতম বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা জাসদ গঠনকারী নেতৃবৃন্দেরও অধিকাংশ গণপরিষদ সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন।

বৈধতার এই প্রশ্নটির আইনি-রাজনৈতিক গুরুত্ব যতই বিপুল হোক না কেন, আওয়ামী লীগ এই প্রশ্নটিকে আমলে নেয়নি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে প্রায় অনায়াসে একে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত জনগোষ্ঠীর বদলে যাওয়া আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে নতুন নির্বাচনের দাবিকে উপেক্ষা করায় গণপরিষদের নৈতিক বৈধতার বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের বিতর্কে বারবার ফিরে এসেছে।

২. গণপরিষদের স্বাধীন ভূমিকা কতখানি ছিল

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গুরুতর একটি ত্রুটি হলো গণপরিষদ আদৌ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়নি। রাষ্ট্র ও সংবিধানের ওপর এই ঘটনার ছাপ ছিল অত্যন্ত গভীর। শুরু থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবিধির সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটিতে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভারত কিংবা পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নী পরিষদটি একইসাথে সংসদ হিসেবেও ভূমিকা পালন করলেও[২৭] বাংলাদেশের বেলাতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এ এটা যদিও বলা হয়েছে যে "যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত আকাঙ্ক্ষা এই যে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকরী করা হইবে", এবং ৭ অংশে "গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ভোগ করেন" এমন কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু এই আদেশের ৬ অংশে পরিস্কার করে বলা হয় যে, "রাষ্ট্রপতি তাহার সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন", একইসাথে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার পর সংসদ হিসেবে গণপরিষদের আর কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখার কোনো বিধানও সেখানে উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া, বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২ এ গণপরিষদের কর্মপ্রক্রিয়া বিষয়ে সবিস্তারে বলা হলেও সেখানেও গণপরিষদের কাজ বিষয়ে ৭ অনুচ্ছেদে শুধু বলা আছে "গণপরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবেন"। সংসদ হিসেবে তার ভূমিকা বিষয়ে কোনো শব্দ ব্যয় করা হয়নি, এবং গণপরিষদ সংসদ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল না।

সংবিধানপরিষদ যে অস্থায়ী সংসদ হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আইনসমূহ প্রণয়নের দায়িত্বটি পাবে না, সেটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত, এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের একটা ইঙ্গিতও এখানে পাওয়া যাবে। সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগপর্যন্ত কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হবার সাথেও এর একটা গুরুতর সম্পর্ক রয়েছে। আদতে, এই কয়েক মাসের ক্ষমতার চর্চার ধরনই পরবর্তীকালের বাংলাদেশে সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ভিত্তি রচনা করেছে, এবং সেদিক থেকে বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতাচর্চার ধারাবাহিকতা প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়েছে এবং বাংলাদেশে আজও অব্যাহত আছে।

স্বাধীনতা পাবার পর ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের অধীনে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ীরা দুটি পৃথক সংবিধান পরিষদ গঠন করেন। তাদের বৈধতার উৎস ছিল এই যে, ওই নির্বাচনে নির্বাচিতগণ অবিভক্ত

[২৭] ভারতের বেলায় গণপরিষদ একইসাথে শুধু সংসদ হিসেবে ভূমিকাই রাখেনি, সংবিধান প্রণয়ন শেষে এটি ভারতের অস্থায়ী সংসদে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত এটি সক্রিয় ছিল। Preface, Constituent Assembly Debates Official Report ; Reprinted By Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 2014

বৃটিশ-ভারতের জনগণের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জনরায় গ্রহণ করেছিলেন। নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রদ্বয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবেও এই দুই সংস্থাই কার্যকর ছিল। এভাবে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে সংবিধান পরিষদ সংবিধানসভা ও আইনসভার দ্বিবিধ ভূমিকাই পালন করে। মন্ত্রিসভার ওপর এর কর্তৃত্ব ছিল, মন্ত্রিসভা সংবিধান পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। পরিষদের অনুমতি ছাড়া সরকার কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারতো না, কোনো নতুন কর আরোপ করতে পারতো না।

বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এই গণপরিষদের কোনো আইন প্রণয়নী ক্ষমতা ছিল না, মন্ত্রিসভার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, ছিল না সরকারের ব্যয়ের ওপরও কোনো তদারকির ক্ষমতা। ফলে যে বিপুল বিস্তারী রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির লুণ্ঠন, অপব্যয় এবং তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির কাজে বেপরোয়া ব্যবহার, এটাকে রুদ্ধ করার কোনো আইনি ব্যবস্থা কিংবা জবাবদিহিতা আদায়ের উপায় প্রথম থেকেই ছিল না। সাপ্তাহিক হককথা কিংবা দৈনিক গণকণ্ঠের মতো সমকালীন গণমাধ্যমে অজস্র সংবাদ মিলবে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি ও অপচয়ের।[২৮] এমনকি সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলোর পক্ষেও এই বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি[২৯]। অথচ এই পরিস্থিতির তেমন কিছুই গণপরিষদে প্রতিফলিত হয়নি।

গণপরিষদ সংসদ হিসেবে ভূমিকা না রাখায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কলকারখানার যন্ত্রাংশ ক্রয়; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রির পারমিট থেকে শুরু করে লাইসেন্স, ঠিকাদারি সকল কাজেই রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপক লুণ্ঠন তদারক করার মতো কোনো ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল না। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার বহুপণ্যের উৎপাদন খরচের চাইতেও কম বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে লোকসানী দামে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছিল ডিলার ও পারমিটধারীদের।[৩০] গণপরিষদ সংসদ হিসেবে ভূমিকা না রাখায় এগুলো আলোচনার কোনো সুযোগ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে হয়নি, বরং একদলীয় ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, বহুল আলোচিত কলকারখানা জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সেই সিদ্ধান্তগুলো কোনো সংসদে আলোচনা করে গ্রহণ করা হয়নি, বরং সেগুলো করা হয়েছে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১) এর মতো কতগুলো আদেশ জারি করার মাধ্যমে। উপরন্তু, এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সাথে সমাজতন্ত্রের আদৌ কোনো সম্পর্ক যে ছিল না, বরং এগুলো ছিল এইসব সম্পত্তিকে নতুন ক্ষমতাবানদের সম্পদ বানাবার আইনি কৌশল, সেই পর্যালোচনাও বিশ্লেষকরা ১৯৭২ সালেই করেছেন।[৩১]

রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষণ ও যেকোনো পরিকল্পনা যাচাইবাছাই ও জবাবদিহিতা আদায় করার কাজটি প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে সংসদই করে থাকে। কিন্তু প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় নিরীক্ষণের সেই কর্তৃত্ব সম্পূর্ণতই ক্ষমতাসীন দল ও রাষ্ট্রীয় আমলাদের হাতে। এভাবে, আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল এককভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর, যিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশের ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু করতে পারতেন না। এভাবে গণপরিষদ কার্যত রাষ্ট্রপতির এবং রাষ্ট্রপতি আইনত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই সকল কাজ পরিচালনা করতেন বলে প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্ত হল এবং সরকারের জবাবদিহিতা চাইবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান আর অবশিষ্ট থাকল না।

গণপরিষদকে কোনরকম ক্ষমতা না দেয়ার পেছনে যে যুক্তিগুলো দেয়া হয়, সেটা হলো সংবিধান প্রণয়নে পাকিস্তানের নয় বছর লেগে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের সংবিধান পরিষদকে আর সব দায় থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, যাতে বিলম্ব ছাড়াই তারা দায়িত্বটি পালন করতে পারে। কিন্তু, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়নে একটি বড় সমস্যা ছিল রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ। সংবিধান প্রণেতাদের জন্য এমন একটা ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন করাটা জটিলতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, যেটা আবার পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত কতগুলো জাতি, পক্ষ ও গোষ্ঠীর স্বার্থের সমন্বয়ও ঘটাবে। আরও বেশি সময় লেগেছিল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হবে, সেটি নির্ধারণ করতে। এরপর ছিল ভাষা বিতর্ক, স্থানীয় পরিষদ আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে ঘটবে এইসব জটিলতা। এবং শেষত সংবিধান প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া অবস্থায় গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতায় এটাকে বিলুপ্ত করে দেয়ার ঘটনায় পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন রীতিমত বিপদগ্রস্ত হয়।

কিন্তু বাংলাদেশ বহু দিক দিয়েই পাকিস্তানের এই দ্বন্দ্ব ও জটিলতাগুলো থেকে মুক্ত ছিল। ফলে এই যুক্তি এখানে অবান্তর যে অতি দ্রুত একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদকে আর কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এটা আসলে দায়িত্ব না প্রদান করা নয়, এটা কার্যত ছিল গণপরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তার এখতিয়ারকে সমূলে বিনষ্ট করা। নিজ দলের ভেতরে যে অবিশ্বাস এবং

[২৮] এই প্রতিবেদনগুলোর জন্য দেখুন সাপ্তাহিক হক-কথা সমগ্র, ঘাসফুলনদী, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালেই সাহসী সাংবাদিকতার এই পথিকৃৎ পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়।

[২৯] যেমন, ৭ নভেম্বর, ১৯৭২ এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আবদুল গাফফার চৌধুরীর নিবন্ধ ''সারাদেশ আজ এক কালোবাজার''।

[৩০] আলোচ্য সময়ে পারমিটের রাজত্ব ও বিপুল ভর্তুকিতে সরকারি পণ্য সরকারঘনিষ্ঠদের কিভাবে সম্পদশালী করেছিলো, তার বিবরণের জন্য দেখুন, রেহমান সোবহান, বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭, সারণী ৭

[৩১] ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ এ সাপ্তাহিক স্বাধিকার এ প্রকাশিত বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধ ''আওয়ামী লীগের জাতীয়করণ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে''। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তার যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ গ্রন্থে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতির কারণে পরিস্থিতির বিকাশের ওপর তার আস্থার ঘাটতি থেকেই এটা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।

গণপরিষদের ভেতরে থাকা আওয়ামী লীগের সদস্যরা কেউ কেউ গণপরিষদের হাতে এই ক্ষমতা প্রদানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু এরপর তারা গণপরিষদেই প্রকাশ্যে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতনার উত্তরণ ঘটেছে, এই যুক্তিতে বিরোধী দল নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের যে দাবি উত্থাপন করেছিল তাকে যিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন, সেই কেএম ওবায়দুর রহমান নিজেই পরবর্তীতে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে বিধি সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেন "মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি দাবি জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে এই গণপরিষদকে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌম পার্লামেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হোক।"

সংসদের আর দশটি প্রস্তাবের মতো এই দাবিটিও কোনো ভোটাভুটিতে যায়নি। বরং এরপরই গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান সোজাসুজি ঘোষণা করেন: "মেম্বারদের আর একটা বিষয়ে হুঁশিয়ারি করতে চাই। স্পিকার যখন কথা বলেন, তখন আর কোনো মেম্বরের অধিকার নাই কথা বলার। বললে আপনি মেহেরবানি করে তাকে পরিষদ থেকে বের করে দিতে পারেন।"[৩২]

কে এম ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিয়ে এরপর আর কোনো কথা গণপরিষদে বলেননি। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও এভাবে তাই চাপা পড়ে যায়। গণপরিষদের সংসদ হিসেবে কার্যকর না থাকার, এবং প্রভিন্সিয়াল কন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ জারি করে রাষ্ট্র শাসনের তাৎপর্য বিষয়ে মওদুদ আহমেদ তাঁর এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান গ্রন্থে লিখেছেন:

"সংসদীয় একটি গণতন্ত্র স্থাপনে আদেশটি প্রণীত হলেও কার্যত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতেই কুক্ষিগত থেকেছিল। পদ্ধতির এই পরিবর্তন শেখ মুজিবকে তাঁর পদমর্যাদার পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীত্ব অর্জনে সক্ষম করেছিল। এটা ছিল কাঠামোতে একটা বদল, এর বদৌলতে মুজিব রাষ্ট্রপতির বদলে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকা অব্যাহত থাকলো। এটা সংসদীয় একটা ব্যবস্থাকে দেখালেও বাস্তবে কোনো সংসদ ছিল না। সেখানে এমন একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল যার সদস্যরা নিজের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতেন না এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যেতো না। মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রয়ে গিয়েছিল, হেভিয়াস কর্পাস জাতীয় রিট, অর্ডার কিংবা নির্দেশনামা প্রয়োগ আকারে উচ্চ আদালতের ক্ষমতা রহিত রাখা হয়।"[৩৩]

গণপরিষদে সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া বিষয়েও অজস্র প্রশ্ন আসে। বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭২। দুই দিনের এই অধিবেশনের প্রথম দিনটিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন ও এর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় দিনে ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটিকে ১০ জুনের মাঝে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ১৭ এপ্রিল তার প্রথম বৈঠকে বসে। এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত আহ্বান করে একটি প্রস্তাব নেয়া হয়, এটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিতও হয়। নানান কারণেই মানুষ এই বিজ্ঞপ্তিতে খুব বেশি সাড়া দেয়নি। ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকেও সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে তেমন কোনো গণবিতর্ক, মতামত আহ্বান বা অন্য কোনরকম জনমত যাচাইয়ের আয়োজন করা হয়নি। জনগণকে উদ্দীপ্ত ও অংশগ্রহণ করাবার নামমাত্র কর্মসূচির পরও ৯৮টি স্মারকলিপি আসে। ঠিক কী ঘটেছিল এই ৯৮টি স্মারকলিপির ভাগ্যে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, এগুলোতে কী ছিল তাও জানা যায়নি। এমনকি এগুলোর কোনো প্রতিফলন সংবিধান তৈরির কাজে ছিল কি না, থাকলে তা কিভাবে, সে সম্পর্কে প্রণেতারা কোনো বক্তব্য দেননি। সংসদ ভবনের মহাফেজখানার তালিকায় এদের উল্লেখ পেলেও একাধিক গবেষক সেগুলো খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা আরও বহু দলিলাদির সাথে এগুলোও যথাযথভাবে গ্রন্থনা ও সংরক্ষণ করা হয়নি।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর। সেদিন খসড়া সংবিধান প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করা হয়। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত খসড়া সংবিধান বিষয়ে জনমত যাচাই এর জন্য ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সভা স্থগিত করার আহ্বান জানান। তাকে সমর্থন করেন স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁদের মতে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ মোটেই যথেষ্ট সময় নয়। যা হোক, 'মূল্যবান সময়ের অপচয়' এড়াতে একই সঙ্গে জনগণের মতামত গ্রহণ ও সংসদে আলোচনা চালিয়ে যাবার মত দেন আইনমন্ত্রী। বিলটি নিয়ে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা চলে অক্টোবর তিরিশ পর্যন্ত। এতে দশটি অধিবেশনে আটটি কর্মদিবস জুড়ে প্রায় ৩২ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। ইতিমধ্যেই ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা চারশ চার জনে নেমে এসেছিল, তাদের মাঝ থেকে ৪৮ জন আলোচনা করেন। এর মাঝে ৪৫ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য।

---

[৩২] গণপরিষদ বিতর্ক, সরকারি বিবরণী, প্রথম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা

[৩৩] তর্জমাকৃত, এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান; ইউপিএল, মওদুদ আহমেদ পৃষ্ঠা ১০

গণপরিষদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দাবি করার কারণে আওয়ামী লীগেরই কেন্দ্রীয় নেতা কেএম ওবায়দুর রহমানের গঞ্জনার শিকার হওয়া এবং গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল আইনের কঠোর প্রয়োগ সঙ্গত কারণেই গণপরিষদের সদস্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনা উত্থাপনকে বিপুলহারে নিরুৎসাহিত করে।

অক্টোবর একত্রিশ তারিখে সংবিধান বিল-এর তৃতীয় পাঠ অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ১৬৩টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এর মাঝে ৭০টি প্রস্তাব উত্তাপন করেন ন্যাপ দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং ২৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আজকেও কেউ যদি বাংলাদেশের সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, জাতিদ্বেষী ও স্বৈরতন্ত্রী অনুচ্ছেদগুলোর তালিকা প্রণয়ন করতে চান, গণপরিষদ বির্তকের সংকলনে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আর মানবেন্দ্র লারমা কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর দিকে নজর বোলানোই তার জন্য অনেকটাই যথেষ্ট হবে।[৩৪] এছাড়া খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনেও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত লিখিত আকারে তাঁর ভিন্নমতগুলো তুলে ধরেন। এমনকি, খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চারজন সরকার দলীয় সদস্য ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লিখিতভাবে ভিন্নমত তুলে ধরেন কমিটির প্রতিবেদনে। সদস্য আছাদুজ্জামান খান মত দেন যে "এই ব্যবস্থা সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী এবং ভোটদাতাদের অধিকার লঙ্ঘনকারী, এতে দলের সদস্যদেরকে দলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বশংবদ করে তুলতে পারে।"[৩৫]

উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মাঝে ৮৪টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এর মাঝে একটি বাদে বাকি সবগুলোই আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের উত্থাপিত। এদের অধিকাংশই ভাষাগত পরিমার্জন সংক্রান্ত হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবও ছিল। এদের মাঝে একটি বহুল বিতর্কিত ৭০ অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সদস্য যে দল থেকে মনোনীত হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, সেখান থেকে বহিষ্কৃত হলে বা তিনি পদত্যাগ করলে সংসদে তার সদস্যপদও বাতিল হয়ে যাবে।

১৯ অক্টোবর ১৯৭২ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধান নিয়ে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৩৬] ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র বিলের ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব আওয়ামী লীগের নেতারা করেছিলেন, এটি উল্লেখ করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "সেই গণপরিষদে যেখানে তৎকালীন আওয়ামী লীগের জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব কয়েকদিনের জন্য জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব এনে বক্তৃতা করেছিলেন, সেই গণপরিষদের অন্তত কয়েকজন সদস্য এখানে আছেন, যাদের নাম আমি জানি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ছিলেন, মাওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ সাহেব ছিলেন, শ্রী গৌরচন্দ্র বালা ছিলেন...."। তাঁর এই প্রস্তাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সমর্থন করেন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তর প্রস্তাবের প্রধান যুক্তিটি ছিল এই যে, "কোনো দেশে কোনো সংবিধানে কোনো প্রস্তাব আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত খসড়া সংবিধানকে আলোচনার জন্য রাখা না হয়। এবং কোনো গোষ্ঠী বা কোনো ব্যক্তিকে যদি বলা হয় তাদের মতামত দেয়ার জন্য, তাদের প্রত্যেককেই একটা করে খসড়া সংবিধান তৈরি করে পাঠাতে হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তির পক্ষে বা কোনো গোষ্ঠীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।" তাঁর এই প্রস্তাব উত্থাপনকালে বারংবার তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য তিনি খসড়া সংবিধানের ওপর জনমত যাচাইয়ের জন্য "১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত, অর্থাৎ ১২ দিন মাত্র সময়" চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

চূড়ান্ত পাঠ অনুষ্ঠিত হয় চার নভেম্বর। সেদিনের পাঠে দুই ঘণ্টা সময় নেয়া হয় এবং এরপর সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান প্রণয়নী সভায় খসড়া উত্থাপনের মাত্র ২৪ কার্যদিবসের মাঝে সংবিধান চূড়ান্তরূপে গ্রহণের উদাহরণ বিরল। প্রতিবেশী ভারতে খসড়া সংবিধান প্রকাশ করা হয়েছিল জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে এবং গ্রহণ করা হয়েছিল ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে, সংবিধান প্রণয়নে সময় লেগেছিল ১১৪ কর্মদিবস। ভারতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য থাকলেও সেখানে দলীয় সদস্যদের স্বাধীন আলোচনাকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নী বিতর্ক কতটা অগুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার বেশ কিছু নিদর্শন সমকালীন অনেক রচনায় পাওয়া যাবে। ভারত বা পাকিস্তানের সাথে তুলনায় বিষয়টা আরও মর্মান্তিক এই কারণে যে, ওই দুটি রাষ্ট্রের থেকে ব্যতিক্রমীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা জনগণের মাঝে যে উচ্চতর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছিল, তার কোনো বিপ্লবাত্মক প্রতিফলন সংবিধান প্রণয়নে পাওয়া যায় না।

সংবিধান প্রণয়নকারী সভাকে নির্বাহী বিভাগের ওপর কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া হয়নি বলে পুরো সময়টি রাষ্ট্রপতি নির্বাহী আদেশ বলে আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি তার আদেশবলে ১৬৬টি আইন প্রণয়ন করেন, এর মাঝে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ফাইভ, ১৯৭২ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই আদেশে বাংলাদেশের হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত আদালত হিসেবে অনুমোদন পায়। কিন্তু এই আদেশের মাঝে আইনের শাসনের চেতনা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত ছিল। কেননা এখানে উচ্চ আদালতকে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি; রিট জারি করা, হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রহিবিশন, কো-ওয়ারানটো, সারটিওরারি আকারে আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান বন্ধ করা হয়। ফলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে নতুন সংবিধান কার্যকর হয় বটে, তবে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল নতুন সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত ২১০টি নির্বাহী আইন প্রণয়ন করা

[৩৪] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, বাংলাদেশ গণপরিষদ, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১৪-২১

[৩৫] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, বাংলাদেশ গণপরিষদ, পৃষ্ঠা ৬

[৩৬] গণপরিষদ বিতর্ক, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২

হয় কোনরকম আলোচনা বা জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার সাথে পরামর্শ ও বৈঠক ছাড়া। এভাবে নতুন সংসদের আধিবেশন বসার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র কার্যত রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ বলে পরিচালিত হয়, যদিও আওয়ামী লীগ দাবি করে যে তারা একদম শুরু থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিরত ছিল।

এভাবে সংবিধান পরিষদকে (ক) কেবলমাত্র সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা, (খ) তাদের আইন প্রণয়ন করার অধিকার না দেয়া, (গ) নির্বাহী বিভাগের ওপর তাদের কোনো তদারকির অধিকার না দেয়া, (ঘ) সংবিধান পরিষদের সদস্যদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে প্রস্তাব উত্থাপন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার প্রদান না করা (এবং কার্যত এর মাধ্যমে সংবিধান পরিষদকে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটিতে পর্যবসিত করা) বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসকে শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং কার্যত একটিমাত্র দলের স্বার্থরক্ষায় পরিচালিত করেছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থকে আওয়ামী লীগের স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গী করা হয়, এবং আওয়ামী লীগের মাঝে আবার একক নেতার মুখ্য ভূমিকার কারণে আর কোনো ভিন্নমত প্রকাশের পরিসর খুব বেশি ছিল না।

৩. ৭২-এর সংবিধান নিয়ে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া

১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন হবার পর থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সংবিধান গৃহীত হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এই প্রতিক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী রাজনীতির সাথে সম্পর্কিতদের প্রতিক্রিয়া, আওয়ামী বিরোধী বামপন্থী ধারাগুলোর প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া।

আওয়ামী লীগের মিত্রদের গুরুত্বপূর্ণ দল সিপিবি সাধারণভাবে এই সংবিধানকে স্বাগত জানায়। তাদের বিবৃতিতে বলা হয় "বিশেষত, খসড়া সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়ন ও সাম্প্রদায়িকতা বিলোপের জন্য যে সব নীতি ঘোষিত হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক দল ও সংস্থা গঠন নিষিদ্ধ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, সেইসব নীতি ও ধারা-উপধারাগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত জানাইতেছে। কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করার যেসব বিধান খসড়ায় রহিয়াছে, সেগুলিকেও পার্টি স্বাগত জানাইতেছে। ঐসব নীতি ও ধারা-উপধারাগুলি খসড়া সংবিধানে পরিবেশিত হওয়াতে পার্টি সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছে। পার্টি খসড়া সংবিধানকে সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে করে।" ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সেখানে বলা হয়: "দল হইতে বহিষ্কার সম্পর্কে খসড়াতে যেসব ধারা উপধারা আছে, তাহাতে আন্তপার্টি গণতন্ত্র ও সদস্যের পার্লামেন্টে স্বাধীন মত প্রকাশ করার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার এবং দলগুলির ভিতরে রেজিমেন্টেশনের আশঙ্কা আছে।"[৩৭]

ন্যাপ (মোজাফফর) সংবিধানের বেশ কিছু ধারার অগণতান্ত্রিক চরিত্রের সমালোচনা করে বলে, "শাসনতন্ত্রের মূল রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র কতকগুলি সদিচ্ছার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূরণে রাষ্ট্র আইনানুগভাবে বাধ্য নহে।" এরপর ন্যাপ "প্রতিটি নাগরিকের কর্ম ও জীবিকার অধিকার, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনধারণের উপকরণসমূহের গ্যারান্টি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রদান" করার দাবি জানায়। এছাড়া শাসনতন্ত্রে পুঁজিবাদী সম্পত্তির বিকাশ ঘটতে দেয়া যাবে না, এই মর্মে সুস্পষ্ট ঘোষণারও তারা দাবি জানান। অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিকাশের জন্য বিশেষ বিধান রাখার দাবিও জানান হয়।[৩৮]

সাধারণভাবে বলা যায়, সংবিধানের মৌলিক অগণতান্ত্রিক চরিত্রটি তাদের সমালোচনায় অনেকটাই উঠে আসলেও আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে মৈত্রী থাকার কারণেই ৭২-এর সংবিধানের প্রতি তারা পুরোপুরি আনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় পূর্বে বলা বিবৃতির পর মস্কোপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯ অক্টোবর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে মত প্রকাশ করে যে, "এই বিষয়ে অন্তত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলসমূহ এবং গণপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ গ্রহণ একান্ত জরুরি ছিল। সংবিধানের পক্ষে সমগ্র জনতার পরিপূর্ণ সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে উহা সহায়ক হইত। মনে হয়, শাসক দলের সংকীর্ণ দলীয় চিন্তার ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই।"[৩৯] অর্থাৎ মূলগতভাবে তারা সংবিধানকে ইতিবাচক বলে গ্রহণ করেন এবং একে আরও গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে পার্টি নেতা আবদুস সালাম ও মনি সিংহ ১১টি প্রস্তাব পেশ করেন। সংবিধানের "কালাকানুনগুলো যেন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়, সেটার দিকে সজাগ প্রহরা রাখার কথা"ও তারা উল্লেখ করেন। যদিও এই 'সজাগ প্রহরা রাখা'র কাজটি তারা তেমন একটা করতে পারেননি; সরকার অচিরেই ধর্মঘটকে বেআইনি করে, শ্রমিক অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদকদের গ্রেফতার এবং পত্রিকা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পত্রপত্রিকাকে দমন করার চেষ্টা করা হয়। আওয়ামী লীগের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতার সম্পর্ক থাকায় মস্কোপন্থী সিপিবি ও ন্যাপ কখনো কখনো মৃদু সমালোচনা করলেও এসবের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি দেয়া জাসদ ও ন্যাপ

[৩৭] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে সিপিবি, দৈনিক সংবাদ, ১৫ অক্টোবর, ১৯৭২

[৩৮] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে ন্যাপের অভিমত, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২

[৩৯] সংবাদ, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২, কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক সম্মেলন, সংবিধানের ১১টি সংশোধনী পেশ

(ভাসানী) বরং সিপিবির রোষের শিকার হয়। এই সময়ে প্রকাশিত বহু বিবৃতি ও ভাষ্যে সিপিবি সরকারের দুর্নীতি ও লুণ্ঠন এবং ব্যর্থতা স্বীকার করেও সরকারকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করার জন্য ওই বিরোধী দলগুলোর গৃহীত আন্দোলন কর্মসূচিরই নিন্দা করে।

অন্যান্য বামপন্থীরা সংবিধানসভা বা গণপরিষদের বৈধতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেন, খসড়া সংবিধানের অমোচনীয় ও মৌলিক অগণতান্ত্রিক চরিত্র বিষয়েও তারা আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। লেলিনবাদী কমুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অমল সেন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এই সংবিধান সমাজতান্ত্রিক তো নয়ই, এমনকি অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে ধরনের সাংবিধানিক অধিকার থাকে তাও নেই।" শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয় "বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র বলা চলে।... এই শাসনতন্ত্র চালু হলে দেশে শ্রেণী-শাসন অব্যাহত থাকবে। দেশ স্বাধীন হবার পর কুখ্যাত পাকিস্তানী নাগরিকদের যে সম্পত্তির মালিক সরকার হয়েছে খসড়া সংবিধানে সেই সম্পত্তিকে একটা সমাজতান্ত্রিক লেবেল লাগিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে।... এমনকি কতিপয় আইন কার্যকর থাকবে বলে ঘোষণা করে বিদেশী মূলধন জাতীয়করণ না করার সরকারি সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পাকাপোক্ত করা হয়েছে।"[৪০]

সমাজবাদী দলের খান সাইফুর রহমান ও নির্মল সেন খসড়া সংবিধানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দলের পক্ষে বিবৃতিতে তাঁরা বলেন "রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাস্তবায়নে আদালতের শরনাপন্ন হবার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে"; "খসড়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হলে দেশে উঠতি ধনিকশ্রেণি ও জোতদারদের রাজত্ব পাকাপোক্ত হবে এবং সমাজতন্ত্রের নামে শ্রেণিশোষণ অব্যাহত থাকবে।"[৪১]

২৫ অক্টোবর গণপরিষদে মানবেন্দ্র লারমা বারংবার বাধার মুখে বক্তৃতা করেন, সেখানে তাঁর বলা একটি বাক্য পরবর্তীতে বহুবার ১৯৭২-এর সংবিধান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে: "শাসনতন্ত্র বিলের প্রতিটা ধারাই প্রমাণ দেয় যে, একহাতে জনগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে, আবার অন্য হাতে সে অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে।"

জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকা আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ তাদের বিবৃতিতে খসড়া সংবিধানের বিস্তারিত সমালোচনা করেন। সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকটি মূল বক্তব্য হলো:

১. খসড়া সংবিধানের ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫ প্রভৃতি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষিত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রতি যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, একে প্রকৃত গণতন্ত্র না বলে 'নিয়ন্ত্রিত' গণতন্ত্র বলা উচিত।

২. অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞাহীনতার ফলে অন্য জাতীয়তাবাদ বা ফ্যাসিবাদী বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। এটা যে কোনো জাতির জন্য মারাত্মক।

৩. রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তা দেখে যে কোনো আত্মসচেতন নাগরিকরই রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন। কারণ খসড়া সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে 'শোবয়' এবং প্রধানমন্ত্রীর খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে।

৪. খসড়া সংবিধানে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্তির পদ্ধতিগত কারণে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য। তাঁদের মত অনুযায়ী, "এক কথায় বলা যায়, এটা একটা অকেজো সংবিধান। তবে বর্তমান পরিবেশে এ বাজে সংবিধানও সংবিধানহীন দেশের জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল।"

এই সংবিধানকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দেশবাসীর প্রতিফলন ঘটানো সংবিধান প্রণয়নের আগ পর্যন্ত "অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে" গণ্য করেছিল।[৪২]

মাওলানা ভাসানী এবং আরও কিছু রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ধারার উপস্থিতি, বিদেশী মালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা, গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদ উচ্ছেদে কার্যকর ভূমিকা না রাখা ইত্যাদি প্রশ্নে সমালোচনা করেন। তাঁদের অধিকাংশই গঠনগত দিক দিয়ে এই সংবিধানের ত্রুটিগুলোকে অমোচনীয় বলে মনে করতেন।

সংবিধানের নানা ধারার মাঝে স্বৈরতান্ত্রিক উপাদান বিষয়ে বিরোধীদলগুলো নানাভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বদরুদ্দীন উমর একটি পর্যবেক্ষণে যে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী এই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছিল, তাদের শ্রেণীগত দুর্বলতা আর অস্থিরতা দিয়েই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন। যে ধারার উপস্থিতির কারণে গণপরিষদের কোনো সদস্য স্বাধীনভাবে মত

[৪০] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২

[৪১] খসড়া সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া, দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২

[৪২] সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান অন্তবর্তীকালীন গণ্য করতে হবে, গণকণ্ঠ, ২১ অক্টোবর, ১৯৭২

প্রকাশ করতে আইনানুগভাবে অক্ষম ছিলেন, এবং যে ধারাটি গণপরিষদকে কার্যত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির সাথে একাকার করে ফেলেছিল, সেই বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশটিও খসড়া সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে (অনুচ্ছেদ ৭০) সংযোজিত হয়। এই ধারাটিকে উপলক্ষ্য করে বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর সঙ্কটটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, খসড়া সংবিধান প্রকাশ হবার পর ১৯৭২ সালের ২৯ অক্টোবর A Constitution for Perpetual Emergency নামে তাঁর একটি নিবন্ধে তা প্রকাশিত হয়, যার বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায় "চিরস্থায়ী জরুরি অবস্থার একটি সংবিধান"। এখান থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি আমাদের বর্তমান আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক:

"শাসক-শ্রেণী যে রাষ্ট্রের মৌলিক সবগুলো প্রতিষ্ঠানকেই বিপুল পরিমাণে অবিশ্বাস করে, এই সংবিধান তারই ইঙ্গিতবহ; এবং সংসদীয় সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে সংবিধান সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ জোগান দেয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনকি সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও নির্ভরযোগ্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে এটাকে স্রেফ প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব একটা হাতিয়ার বানিয়ে ফেলা হয়েছে, যাকে শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে অসীম ক্ষমতা চর্চা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। এই খসড়া সংবিধান পরিস্কারভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী কেবল অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে জর্জরিতই নয়, মোটাদাগে তারা অসংহতও। ... এইরকম একটি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী দৃশ্যমান রয়েছেন সম্পূর্ণ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় শর্ত হিসেবে। এই কারণেই অন্যদের নানারকম আপত্তি সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তারা তাদের আস্থা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পণ না করে তার ওপর স্থাপন করতেই বাধ্য। আর এ কারণেই শাসকশ্রেণীর একনায়কত্ব একজন প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের রূপে পর্যবসিত হবার দিকে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে তা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বৈরতন্ত্র। সুনির্দিষ্টভাবে শেখ একজন বেসামরিক ব্যক্তি বলেই প্রাথমিক পর্বে এই স্বৈরতন্ত্র একটা সংসদীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগামীকাল যদি পরিস্থিতি বেসামরিক কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায় এবং শাসক শ্রেণীর জন্য আরও খারাপ হয়ে ওঠে, সংসদীয় ধরনটি রাষ্ট্রপতির ধরনের শাসন দিয়ে কিংবা আরও খারাপ কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এইসব জরুরি কারণবশতই এখানে একটি 'চিরস্থায়ী' জরুরি অবস্থার পূর্বানুমান করা হয়েছে এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে শাসকগোষ্ঠীর জন্য একটি সংবিধানের কাঠামোর ভেতরে সকল ধরনের জরুরি ক্ষমতা অনুশীলনের বন্দোবস্ত করারই একটা প্রয়াস নেয়া হয়েছে।" [তর্জমাকৃত]

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ নিজেই চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করেছিল। আদি সংবিধানে জরুরি অবস্থার কোনো বিধান না থাকলেও যে জরুরি অবস্থা এবং শাসকশ্রেণীর অসংহত দশা বদরুদ্দীন উমর আশঙ্কা করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়; সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের বদলে একদলীয় শাসন, এবং কার্যত দলীয় প্রধানের ব্যক্তিগত শাসন শুরু হয়। অধিকাংশ পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়, এবং যে অল্পকিছু গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সংবিধানের ছিল, তাও রদ করা হয়। বদরুদ্দীন উমর লিখেছিলেন, "১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনও যে বায়াত্তুরে সংবিধানকে উচ্ছেদ করেনি, তার কারণ গুণগতভাবেই এই সংবিধানটিই এমন ছিল যে এই কাঠামোর ভেতর ছোটখাট কিছু সংশোধনীর মাধ্যমেই সামরিক শাসকরাও নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পেরেছিল।"

৭২-এর সংবিধান নামে সংসদীয় কাঠামো প্রবর্তন করলেও কার্যত যে তা ছিল না, তা মওদুদ আহমেদ তার সমালোচনাতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে,

"রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটে, ঠিক তেমনি ঘটেছে এই ক্ষেত্রে— ক্ষমতা এককেন্দ্রীকৃত হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৫৩টি ধারা সংবলিত খসড়া সংবিধানটি যখন ৪ নভেম্বর তারিখে গৃহীত হলো তখন দেখা গেল সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ঘটানোর ও মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থাদি সংবিধানে রয়ে গেছে। সংবিধানে কিভাবে ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেটা সংবিধানের ৫৫, ৪৮ ও ৭০ অনুচ্ছেদ পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যায়। ৫৫ অনুচ্ছেদের ৪ থেকে ৬ উপধারায় বলা হয় যে, সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিই নির্বাহী আদেশ দেবেন এবং তিনিই হবেন এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ব্যক্তি। এ নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। অন্যদিকে ৪৮ অনুচ্ছেদের ৩নং উপধারা মতে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া সব দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন এবং নির্বাচিত হবার পর রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিচ্ছেন; কিন্তু নির্বাহী আদেশের দায়-দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর থাকছে না এবং আইনের কাছে তাঁর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি চাইলে আর কি-কি করতে পারেন। যেহেতু তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু তিনি ওই দলের যে কোনো সদস্যের সংসদ-সদস্য পদ ছিনিয়েও নিতে পারেন; সে ক্ষমতা তাঁকে ৭০ নং অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। ফলে একই ব্যক্তি দল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও সংসদের নেতা হচ্ছেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন।"[৪৩]

নাগরিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা না দেয়া এবং ক্ষমতা একব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত করার যে প্রধান দুটি সমালোচনা ১৯৭২ এর সংবিধান বিষয়ে তৎকালীন বিভিন্ন মহল থেকে এসেছিল, বাংলাদেশের পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহেও সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিপুল

[৪৩] মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, পৃষ্ঠা ১৪, ইউপিএল

প্রভাব ফেলেছে। এই কারণেই সংবিধান বিষয়ক পরবর্তীকালীন কিছু পর্যালোচনাও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করা বিষয়ে গুরুতর সব অসঙ্গতির উপস্থিতি সত্ত্বেও স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী আশাবাদের কারণে অনেকেই এগুলোর উপস্থিতিকে না দেখার ভান করেছেন। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য শাসক দল আওয়ামী লীগ গায়ের জোরেই এগুলোকে উপেক্ষা করেছে। অচিরেই, ৭২-৭৫ সময়ের মাঝেই একদিকে সংবিধানের ত্রুটিগুলো স্পষ্ট হতে থাকে, অন্যদিকে আরও নতুন নতুন সব পরিবর্তন এনে সংবিধানকে আরও গণবিরোধী চরিত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালের সংকটগুলোর বীজ যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাঝেই ছিল, তা পরের এই সময়গুলোতে সংবিধান নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তারা অনেকবারই সনাক্ত করেছেন।

গণপরিষদকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেয়ার পেছনে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং জনগণের গণতান্ত্রিক উত্থানকে প্রতিহত করতে নিপীড়নের আশ্রয় নেয়া, এই দ্বিবিধ দুর্বলতা ভূমিকা রেখেছে। শ্রেণীগত অভ্যন্তরীণ সংকট ও দুর্বলতা তাদেরকে ভীত করে তুলছিল, তাই সংবিধান কার্যকরী হবার এক বছর না পেরুতেই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় 'শত্রু দমনে'র একটা পথ তৈরী করা হলো, ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সংসদে আনীত হলো "সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ১৯৭৩ [১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন]।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা শুধু ৭০ অনুচ্ছেদ নয়, পুরো সংবিধান জুড়েই ছিল, এবং সেটাই বাংলাদেশের পরবর্তীকালের অগণতান্ত্রিক শাসনকে ডেকে এনেছে, পুঞ্জীভূত করেছে। এই বিষয়ে একটি কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা লিখেছেন অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম। ৭২-এর সংবিধান প্রণয়নের সময়ে এই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কিভাবে ঘটলো, সেটা বুঝতে গণপরিষদের বাইরের এই ঘটনাটি হয়তো বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

"সংবিধানের আরেকটি মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে 'নির্বাচিত একনায়কের' ক্ষমতা দিয়ে সর্বশক্তিমান করে ফেলার ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে যখন সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে যখন সেটা বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করেছিল, তখন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে কেটেছেঁটে ওগুলোয় পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির তুলনায় একচ্ছত্র (অ্যাবসলিউট অ্যান্ড আনচ্যালেঞ্জড) করার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাহীন বানিয়ে ফেলা হয়েছিল।

ব্যাপারটি আমাকে বলেছিলেন ওই কমিটির সদস্য দৈনিক আজাদীর প্রয়াত সম্পাদক সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক খালেদ। কমিটির কাছে কাটাকুটি করা খসড়াটি যখন ফেরত এসেছিল, কমিটির কারও সাহস হয়নি বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে করা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছু করার।"[৪৪]

সংবিধানের বহুল আলোচিত এই ৭০ অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত করায় শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত প্রভাবের কথা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও উল্লেখ করেছেন। সংবিধানের বাংলা অনুবাদ বিষয়ে তিনি খসড়া কমিটিকে সহায়তা করার কারণে ড. কামাল হোসেনের সঙ্গী হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ নিতে গিয়ে তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হন। [৪৫]

কবি ও বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মজহার ১৯৭২ সালের সংবিধানের সার্বভৌম সংসদের ধারণা কিভাবে জনগণের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করেছে, তা স্পষ্ট করতে চতুর্থ সংশোধনী কিভাবে সম্ভব হলো, তা উপস্থাপন করেছেন দৃষ্টান্ত হিসেবে। তাঁর "সংবিধান ও গণতন্ত্র" বইতে তিনি লিখেছেন,

"কীভাবে মৌলিক অধিকার বিরোধী বিধান সংসদ পাশ করতে সক্ষম হোল? মূল সংবিধানের ১৪২ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা আছে, এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও (ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধিত ও রহিত হইতে পারিবে'।

এর মানে হোল মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সংবিধানে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুই তৃতীয়াংশ ভোটে পার্লামেন্টের সদস্যদের জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে নেবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংসদকে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে সংবিধান মিসমার করে দেবার ক্ষমতা যেমন দেয়া হয়েছে, তেমনি যেমন খুশি তেমন আইন তৈরি করবার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের 'সার্বভৌম সংসদ'।[৪৬]"

ফলে ফরহাদ মজহারের বিবেচনায় চতুর্থ সংশোধনী কিংবা বাকশালের মধ্য দিয়ে ৭২ এর সংবিধান বাতিল হয়নি, বরং সেগুলো ছিল ৭২ সালের সংবিধানের অনিবার্য পরিণতি। এ বিষয়ে তিনি লেখেন,

[৪৪] মইনুল ইসলাম, সংবিধানের যে ভুল সংশোধন না করলে রাষ্ট্র সংস্কার অসম্ভব, প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০২৪]

[৪৫] আনিসুজ্জামান, বিপুলা পৃথিবী, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪, প্রথমা প্রকাশনী

[৪৬] ফরহাদ মজহার, সংবিধান ও গণতন্ত্র, পৃ. ১৪৫ আগামী প্রকাশনী

"এটা পরিষ্কার যে, একটি মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন হওয়া জনগোষ্ঠী এবং অন্য দেশের স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রসভায় উদিত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিগঠন সম্পন্ন করবার জন্য কোনো সাংবিধানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়নি। সেই উদ্দেশ্যে সংবিধান লেখাও হয়নি। কী করে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সাংবিধানিকভাবে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং একমাত্র আওয়ামী লীগই দেশ শাসন ও শোষণ করতে পারে—এইসবই ছিল প্রধান বিবেচনা। এই বিবেচনার ভয়াবহ পরিণতি এখন আমাদের ভুগতে হচ্ছে। সংবিধান রচনার মূল উদ্দেশ্য একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি না। পরবর্তীকালে বংলাদেশের রক্তাক্ত ইতিহাস এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পেছনে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভূমিকা বিচার না করে কী করে আমরা এখন সামনে অগ্রসর হবো? মনে রাখতে হবে বাকশাল একনায়কতন্ত্র কায়েম করেনি একনায়কতন্ত্রের বাইরের খোলসটা ফেলে নগ্ন হয়ে উঠেছিল কেবল। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যেই এখনকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চেহারা নিহিত ছিল।"[৪৭]

এভাবেই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরবর্তীকালের অগণতান্ত্রিক প্রবণতা ও শেষপর্যন্ত ফ্যাসিবাদের বীজ ৭২ সালের সংবিধানের মাঝেই নিহিত ছিল। এরই ফলাফল হলো প্রতিটি আমলেই ক্ষমতার পুঞ্জীভবন আরও ঘনীভূত হয়েছে, আমলাতান্ত্রিকতা আরও প্রকট রূপ পেয়েছে, বিচারবিভাগ ক্রমশ বেশি বেশি হারে দলীয়করণের শিকার হয়েছে, জবাবদিহিতার অভাবে ক্ষমতাসীনদের আর্থিক দুর্নীতি আরও প্রবল চেহারা নিয়েছে। একইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দল, রাষ্ট্র ও সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করেছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ধ্বংস করেছে। এভাবে ১৯৭২ সালে একজন একক ব্যক্তি ও একটি দলকে কেন্দ্রে রেখে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত উত্তরোত্তর স্বৈরতন্ত্রী চেহারা ধারণ করতে করতে অবশেষে বাংলাদেশ জুড়ে একটি ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে।

[৪৭] ফরহাদ মজহার, সংবিধান ও গণতন্ত্র, পৃ. ৭৫, আগামী প্রকাশনী

সংবিধানের পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

১. সংবিধানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত বিন্যাস

১.১ বাংলাদেশের সংবিধান একটি দীর্ঘস্থায়ী ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের পটভূমিতে প্রণীত হয়েছিল, যা এর মূল্যবোধ, ভাষা এবং কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়। এর অভিব্যক্তি কর্তৃত্ববাদী, ক্ষমতাকাঠামো কেন্দ্রীভূত এবং অনেকক্ষেত্রে শাসনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। যদিও সংবিধান 'জনগণের অভিপ্রায়'কে চূড়ান্ত উৎস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, তবু এর সামগ্রিক রূপায়নে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার কায়েমে নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ যথাযথভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

১.২ সংবিধানের প্রতিটি শব্দ ও বিন্যাস অর্থবহ এবং এর চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। সংবিধানের বাংলা সংস্করণে শব্দ নির্বাচনেও, যেমন প্রজাতন্ত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী, ক্ষমতা, প্রশাসন, কর্মচারী, শাসন, অধস্তন, স্থানীয় শাসন ইত্যাদি এবং ইংরেজি সংস্করণে servant, power ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক বাচনভঙ্গির ধারাবাহিকতা ফুটে উঠে, যা 'জনগণের অভিপ্রায়' অভিব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংবিধানের ভাগ গুলি সাজানোর ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ, রাষ্ট্রের অন্য দুটি বিভাগের, অর্থাৎ আইনসভা ও বিচার-বিভাগের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

২. প্রস্তাবনা

২.১ জনগণের অভিপ্রায়

যদিও প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে সংবিধান 'জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ', বাস্তবে এটি কেবল একটি কথার বুলিতে পরিণত হয়েছে। সংবিধানের বর্তমান কাঠামোতে 'জনগণের অভিপ্রায়' কথাটি সামান্যই অর্থ বা তাৎপর্য বহন করছে। সংবিধানের বিধানসমূহের মাধ্যমেই জবাবদিহিহীন, মহাপরাক্রমশালী এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা সুসংহত হয়েছে।

২.২ প্রস্তাবনায় গণপরিষদের উল্লেখ

প্রস্তাবনার শেষাংশে নির্দিষ্ট তারিখসহ গণপরিষদের উল্লেখ থাকায়, প্রস্তাবনায় ১৯৭২ সাল পরবর্তী ঘটনা বা বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রহিত করে। যদিও উপমহাদেশের কিছু সংবিধানে এমন উল্লেখ রয়েছে, সাধারণত এ বিষয়ে বৈশ্বিক চর্চা ভিন্ন রকম। যদি প্রস্তাবনার শেষ অনুচ্ছেদটি সংবিধানের একটি উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল আকারে বিকশিত হতে পারবে।

৩. সংবিধানের মূলনীতি

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা – এই চারটি আদর্শ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস এবং এ কারণেই এগুলো সংবিধানের মূলনীতি হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ছিল ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। ঐ ঘোষণাপত্র বাংলাদেশকে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যার মূলনীতি ছিল 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার'। ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত মূলনীতির পরিবর্তে কেন সংবিধানে নতুন মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করা হলো তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় দেওয়া হয়নি। সংবিধানের ৯-১৩ নং অনুচ্ছেদে চার মূলনীতি সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শব্দসমূহ দেশের জনগণকে এইসব মূলনীতির আলোকে সংঘবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩.১ জাতীয়তাবাদ

৩.১.১ বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিসত্তা (ethnicities) রয়েছে। জাতীয়তাবাদকে 'বাঙালি' হিসেবে সীমাবদ্ধ করার ফলে নিজস্ব পরিচয় রয়েছে এবং 'বাঙালি' হিসেবে পরিচিত হতে চান না এমন জাতিসত্তার লোকদের মধ্যে অস্বস্তি ও অংশীদারিত্বমূলক অনুভূতির

অভাব তৈরি হয়েছে। জাতীয়তাবাদ জাতিকে একীভূত করে । কিন্তু জাতীয়তাবাদকে কেবল 'বাঙালি' হিসাবে সীমাবদ্ধ করার ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের প্রান্তিক এবং একক জাতীয় পরিচয় থেকে বঞ্চিত মনে করে।

৩.১.২ গণপরিষদে জনাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরোপ করার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "কিন্তু, আমি একজন চাকমা। আমার বাবা, দাদা, বাপ-দাদা কখনো বলেননি আমরা বাঙালি। অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার আবেদন, আমি জানি না, এই সংবিধান কেন আমাদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়... আমরা কখনোই আমাদের বাঙালি হিসেবে বিবেচনা করিনি... এই সংশোধনী পাস হলে চাকমা জাতির অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক... আমরা আমাদের বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি নয়" ।[১] খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য জনাব সাজেদা চৌধুরী এর জবাবে যুক্তি দেন যে, বাঙালি হিসেবে অন্তর্ভুক্তি তাদেরকে একটি সম্মানজনক অবস্থান প্রদান করবে; কেননা এটি তাদেরকে উপ-জাতির (sub-nation) পরিবর্তে একটি জাতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[২] এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থানকে প্রতিধ্বনিত করেছিল; তিনি অ-বাঙালি জাতিগত সম্প্রদায়সমূহকে বাঙালি পরিচয় গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐক্যের প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপিত হলেও এর অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক চরিত্র সমালোচিত হয়েছে। কেননা, এতে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় বিলিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে অভিযোজনের (acculturation) প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি স্বাধীন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে কার্যত অস্বীকার করেছে।

৩.১.৩ সংবিধান[৩] 'বাংলাদেশের জনগণ' ও 'বাংলাদেশের নাগরিক' এর মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করেছে। যদিও এটি খুব সীমিত প্রায়োগিক তাৎপর্য বহন করে, তবু এটি দুই ধরনের কৃত্রিম পরিচয় তৈরি করে : জাতি ও নাগরিকত্ব। যদিও অনুচ্ছেদ ২৩ (ক)[৪] উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর আরোপ করেছে, তবু বাংলাদেশের সকল জনগণকে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে জনগণের ঐক্যকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করেছে এবং যারা বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবেই তাদের বৈচিত্র্যময় জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত হতে চান তাদেরকে আলাদা করেছে।

৩.২ সমাজতন্ত্র

১৯৭২ সালের সংবিধানেও সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের সামান্যই প্রাসঙ্গিকতা ছিল। প্রস্তাবনায় অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের একটি মূল লক্ষ্য হবে। এই ধরনের সমাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'র[৫] প্রতিষ্ঠাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে অন্য কোনো ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের পুরো ধারণাটাই একটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তদপুরি, যেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়, তাই সূচনা থেকে তাঁর পুরো যাত্রা জুড়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি সর্বদা পুঁজিবাদ দ্বারা চালিত হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত[৬] এবং সম্পত্তির বাধ্যতামূলক গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল[৭] এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তবু সংবিধানে বেসরকারি মালিকানার প্রাধান্য এবং সরকারের দীর্ঘদিনের চর্চা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি অপ্রাসঙ্গিক ধারণায় পরিণত করেছে।

৩.৩ ধর্মনিরপেক্ষতা

৩.৩.১ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সংবিধানের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত মূলনীতিগুলোর একটি। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। তবে, কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নে কোনো বিষয় বিলোপ করা হবে সে সম্পর্কে সংবিধানে[৮] উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] পৃষ্ঠা ৪৫২, গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৭২

[২] পৃষ্ঠা ২৯৩, গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৭২ (নোট ৩)

[৩] অনুচ্ছেদ ৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা আছে, '(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।
(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।'

[৪] অনুচ্ছেদ ২৩ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

[৫] অনুচ্ছেদ ১০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।'

[৬] অনুচ্ছেদ ১৩ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৭] অনুচ্ছেদ ৪৭ (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৮] অনুচ্ছেদ ১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৩.৩.২ ১৯৭৭ সালে একটি সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সংবিধানে প্রথমবারের মতো "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)" সংযোজন করা হয়[৯]। এটি পরে ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। যদিও পঞ্চম সংশোধনীর মামলায়[১০] সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৯ সালের সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইনকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছিলেন, তবু ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীতে সামান্য পরিবর্তন করে "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে)" সংযোজন করা হয় । লক্ষণীয় যে, এই বিষয়ে অতীতে সরকার গঠনকারী সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে।

৩.৩.৩ সংবিধানের ৮ম সংশোধনী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রবর্তন করে।[১১] সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীতে আওয়ামী লীগ সরকার 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পুনরুজ্জীবিত করার সময় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বজায় রেখে কিছু পাঠগত পরিবর্তন আনে।[১২] উচ্চ আদালতের একটি বৃহত্তর বেঞ্চ[১৩] রায় দেন যে, সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদ প্রস্তাবনার মূলনীতির সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ সৃষ্টি করে না, এবং এটি সংবিধানের অন্য কোনো বিধানের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক নয়। আদালত আরও বলেন যে, এটি সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সংবিধানে একক রাষ্ট্রধর্মের রাজনৈতিক ও আইনি স্বীকৃতি বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি অদ্ভুত ধারণায় পরিণত করেছে।

৩.৪ গণতন্ত্র

বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অপর্যাপ্ত; এতে স্পষ্টতা ও বোধগম্যতার অভাব রয়েছে। সংবিধানে প্রতিনিধিত্বশীল ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র বিষয়ে স্পষ্টত কোনো বিধান নেই- যা যে কোনো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য অপরিহার্য।

৪. অধিকারসমূহ

৪.১ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের অবলবৎযোগ্যতা

৪.১.১ বাংলাদেশের সংবিধানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক অধিকার (ইএসসি অধিকার) সংক্রান্ত বিষয়গুলো বলবৎযোগ্য নয়। বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো মানবাধিকারকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে: দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অবলবৎযোগ্য অধিকারসমূহ যেগুলোকে আরও কিছু নীতির সাথে একত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে; অন্যদিকে তৃতীয় ভাগে বলবৎযোগ্য অধিকারগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই বিভাজন প্রথমত, ইএসসি অধিকার এর বিচ্ছেদ, এবং দ্বিতীয়ত: ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের আলোকে এই অবলবৎযোগ্যতার পিছনের যুক্তি বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। প্রাথমিকভাবে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের সীমিত অর্থনৈতিক সক্ষমতার কারণে আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়। ড. কামাল হোসেন যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অবলবৎযোগ্য ইএসসি অধিকার রাখার প্রবণতা ভারত ও আয়ারল্যান্ডের মতো রাষ্ট্রের সংবিধানেও পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে প্রভাব ফেলেছিল। উপরন্তু, সংবিধান প্রণয়নের কালে International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) - এ কার্যকর বলবৎকরণ ব্যবস্থা ছিলনা, যা ২০১৩ সালে নিরসন করা হয়।

৪.১.২ এই সংবিধানে একটি অঙ্গীকার রয়েছে যে, ভবিষ্যতের সংসদসমূহ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে ইএসসি অধিকার এর বলবৎকরণ নির্ধারণ করবেন।[১৪] এর থেকে বোঝা যায় যে, এই অধিকারগুলোকে স্থায়ী অবলবৎযোগ্য রাখার উদ্দেশ্য গণপরিষদের ছিল না। যদি ESC অধিকারগুলি অপ্রয়োগযোগ্য করে রাখা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ থাকে কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে পর্যায়েই থাকুক না কেন রাষ্ট্র নির্বিচারে ESC অধিকারের প্রয়োগকে অস্বীকার করতে পারে।

৪.১.৩ সংবিধানে বলবৎযোগ্য 'আইন' এর পরিবর্তে 'নীতি' হিসেবে বর্ণিত বিধানসমূহের অবস্থান বাংলাদেশে আইনি কাঠামোয় সঙ্গতিহীন এবং মানবাধিকার প্রয়োগে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই চলমান আলোচনা ইএসসি অধিকারসমূহের সাংবিধানিক ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে, যেন এগুলো সমসাময়িক মানবাধিকারের মানদণ্ড এবং

[৯] দ্য প্রক্লেমেশন (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৭, দ্য প্রক্লেমেশন আদেশ নং I, ১৯৭৭; উল্লেখ্য যে এই শব্দগুচ্ছটির বাংলা অনুবাদকৃত সংস্করণ সংবিধানে দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৮, দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন আদেশ নং IV, ১৯৭৮ দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছে।

[১০] খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি, বিএনপি এবং অন্য বনাম বাংলাদেশ ইতালীয় মার্বেল ওয়ার্কস এবং অন্যান্য ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮

[১১] ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ২(ক) তে উল্লেখ করা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম, তবে প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্ম শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে পালন করা যাবে।'

[১২] ২০১১ সালের পর অনুচ্ছেদ ২(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।'

[১৩] স্বৈরাচার ও সম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি বনাম বাংলাদেশ [২০২৪] ১৯ এস.সি.ও.বি. এইচ.সি.ডি. ৪১ [৩৯]]

[১৪] অনুচ্ছেদ ১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে। সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার (খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থনৈতিক মুক্তি ইত্যাদির অধিকার) ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিৎ।

৪.২ সঙ্কুচিত অধিকার

৪.২.১ সংবিধানে উল্লিখিত অধিকাংশ মৌলিক অধিকারসমূহের ওপর নিম্নোক্ত ধরনের বাধানিষেধ আরোপের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার কার্যত হরণ করা হয়েছে :

ক). যে কোনো বাধানিষেধ (অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫)

খ). যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ (অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩)

৪.২.২ যখন সংবিধান কোনো অধিকার নাগরিককে প্রদান করে, তখন তা অবশ্যই সবার জন্য সমান হতে হয় এবং এগুলোকে ইচ্ছামাফিক পুনঃব্যাখ্যা করার সুযোগ নির্বাহী বিভাগের কাছে ছেড়ে দেওয়া যায় না। একদিকে, আমাদের সংবিধানে কিছু অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে সাধারণ আইনের মাধ্যমে বাধানিষেধ আরোপ করে সে অধিকার খর্ব করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

৪.২.৩ বাধানিষেধের আড়ালে বিভিন্ন সরকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে নাগরিকদের পীড়ন করেছে এবং তাদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার হরণ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪, আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর কথা বলা যেতে পারে।

৪.২.৪ 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' কীভাবে নির্ধারিত হবে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় তার কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি মৌলিক অধিকার সুরক্ষাকে জটিল করে তুলেছে। সংবিধানের ভাষার অস্পষ্টতার ফলে অধিকারগুলোর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস তৈরি হয়েছে যেখানে কিছু অধিকার অন্যগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। এই পার্থক্য মৌলিক অধিকারের মধ্যকার সমতার নীতিকে ক্ষুণ্ন করে এবং এর ফলে International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) এর মতো আন্তর্জাতিক সনদগুলো যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের ক্ষেত্রে যে সমান ব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বলে সেই উদ্দেশ্য থেকেও বিচ্যুতি ঘটে।

৪.২ ৫ বৈশ্বিক মানদণ্ড এবং বাংলাদেশের সমাজের বিকাশমান আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলোর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫. আইনসভা

৫.১ বাংলাদেশের সংবিধান সংসদকে আইন প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদনের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানের পাশাপাশি নির্বাহী বিভাগকে তদারকি ও জবাবদিহিতার আওতায় রাখার কিছু ব্যবস্থাও প্রদান করেছে। তবে এই সাংবিধানিক ক্ষমতা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত কারণে, সংসদ প্রায়শই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের অভিপ্রায় তুলে ধরে এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তার কার্যকরিতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে -

অ. একটি প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ না থাকা।

আ. অকার্যকর সংসদীয় কমিটি।

ই. অকার্যকর ন্যায়পাল।

ঈ. কর্তৃত্ববাদী শাসনকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা; এবং

উ. সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা হরণ।

৫.২ জবাবদিহিতা

৫.২.১ যদিও জনগণ সংসদে তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য একজন এমপিকে নির্বাচন করে থাকেন, তবে নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রতি একজন এমপির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা নেই। নির্বাচনীয় প্রক্রিয়া কেবল বৈধতা আদায়ের একটা উপায় হিসেবে কাজ করে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর সাংসদরা সাধারণত ভোটারদের সাথে সংযুক্ত

থাকার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করেন না। যদিও কোনো কোনো সদস্য প্রশ্নোত্তরের বেলায় মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেন, তবে এই ধরনের চর্চা খুব একটা ব্যবহৃত হয় না এবং যখন হয়ে থাকে সেটা অধিকাংশ সময় ব্যক্তিগত স্বার্থেই হয়ে থাকে।

৫.২.২ নির্বাচনী এলাকার প্রতি দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংসদ সদস্যদের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির কোনো শর্ত নেই, যা তাদের নির্বাচনী এলাকার প্রতি দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে একজন সংসদ সদস্য কেবল তাঁর দায়িত্বই পালন করেন না, গঠনমূলক পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে সংসদ বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। এই অনুপস্থিতি জবাবদিহিতা ক্ষুণ্ণ করে এবং আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

৫.২.৩ আইন-প্রণয়ণের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিধানের অভাব স্বচ্ছতা এবং নাগরিকের সম্পৃক্ততা হ্রাস করে। স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন জনসাধারণের দেখার সুযোগের অনুপস্থিতি এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলে, কেননা এটি জনগণের পক্ষে জবাবদিহিতা ও তদারকিকে সীমিত করে ফেলে। স্থায়ী কমিটিগুলির দ্বারা প্রণীত সুপারিশসমূহ মানতে সরকার বাধ্য না হওয়ায়, তাদের পক্ষে আইন-প্রণয়নে প্রভাবিত করতে কিংবা নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রমের উপর তদারকি করতে কার্যত কোনো ভূমিকা থাকেনা।

৫.৩ এন্টি-ফ্লোর ক্রসিং

৫.৩.১ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ[১৫] সংসদ সদস্যদের বাধ্য করে তারা যে রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছেন, সেই দল প্রস্তাবিত যে কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে নিতে। যদিও তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। যদি তারা তা করেন তাহলে এর পরিণাম খুব কঠোর – তাদের আসন স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হয়ে যায়। সংবিধান দলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের নামে সংসদ সদস্যদের স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করতে বাধা প্রদান করেন।

৫.৩.২ যদিও দলত্যাগ (ফ্লোর ক্রসিং) আটকানো ছিল এই অনুচ্ছেদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, কিন্তু কার্যত এর প্রভাব এই উদ্দেশ্য ছাপিয়ে গিয়েছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সংসদে, সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বাধ্য করার পরিবর্তে, দলীয় হুইপদের কাজ হচ্ছে নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংসদ সদস্যদের ভোট নিশ্চিত করা। ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ফ্লোর ক্রসিং এর বিরুদ্ধে বিধান এখন সংসদে গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী। স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে এই বিধান রাখা হলেও, এটি রাজনৈতিক আলোচনা এবং দলীয় জবাবদিহিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটি সংসদ সদস্যদের তাদের নির্বাচনী এলাকার স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করা ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে।

৫.৪ যথোচিত প্রতিনিধিত্ব (Adequate Representation)

১৭ কোটি মানুষের দেশে ৩০০ টি সংসদীয় আসন অর্থবহ ও যথোচিত প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কিনা এই প্রশ্নও সামনে চলে আসে। যদিও দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবু আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এই ধরনের সীমাবদ্ধতা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়।

৫.৫ সংসদীয় কমিটি

বাংলাদেশের সংবিধানে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে[১৬] সরকারি হিসাব কমিটি ও বিশেষ-অধিকার কমিটিসহ কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিটিসমূহ গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনগত প্রস্তাব

[১৫] অনুচ্ছেদ ৭০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা আছে, 'কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-
(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা
(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।'

[১৬] অনুচ্ছেদ ৭৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা হয়েছে '(১) সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:
(ক) সরকারি হিসাব কমিটি;
(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং
(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।
(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে
(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;
(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;
(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;
(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

যাচাই-বাছাই করা, বিল বিবেচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তদারকি ও তদন্ত করা এবং সুশাসনের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা। তদপুরি, কমিটি প্রদত্ত সুপারিশসমূহের বলবৎকরণের অভাব, অপর্যাপ্ত লজিস্টিক সহায়তা এবং কমিটির ভেতরে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও অংশগ্রহণের সাথে যখন সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ যুক্ত হয় তখন এই কমিটিসমূহ কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় না।

৫.৬ নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন

৫.৬.১ রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সংবিধানের ১৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা হয়।[১৭] তারা কার্যত সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যদের জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকা উচিৎ, দলীয় নেতৃত্বের প্রতি নয়।

৫.৬.২ অন্যান্য এমপিদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ডের বাইরে সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য মনোনয়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। সংরক্ষিত আসনে কে মনোনীত হবে তা নির্ধারণে দলীয় নেতৃত্বের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে। এই প্রক্রিয়া নির্বাচনী সক্ষমতা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে না হওয়ায়, প্রায়শই আইন প্রণয়নে অযোগ্য বা অনুপযুক্ত প্রার্থীরা মনোনীত হতে পারেন। এই ধরনের প্রক্রিয়া নারী প্রতিনিধিদের প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয় এবং সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত করে।

৫.৭ ন্যায়পাল

সংবিধানে সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের[১৮] পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভেতরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদীয় তদারকি প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও দুর্নীতির কবল থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে ন্যায়পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং ২০০২ সালে তা কার্যকর হয়েছিল, তবু এটি বাস্তবে অকার্যকর রয়ে গেছে। কেননা, সংসদ কখনো ন্যায়পালের জন্য কোনো কার্যালয় স্থাপন করেনি বা কাউকে নিয়োগ দেয়নি। এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতার একটি বিস্তৃত সমস্যা হিসেবে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, নির্বাহী বিভাগ তাদের ওপর সংসদের তদারকি ভূমিকা খর্ব করার জন্য কখনো ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠা করেনি। এটাকে বাধ্যতামূলক করার পরিবর্তে, ন্যায়পালের ভাগ্যকে সংবিধান সেই নির্বাহী বিভাগের হাতেই তুলে দিয়েছে যাদেরকে তদারকি ও তদন্ত করাই ন্যায়পালের প্রধান কাজ।

৬. নির্বাহী বিভাগ

৬.১ রাষ্ট্রপতি/রাষ্ট্রপ্রধান

সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা মোটাদাগে আনুষ্ঠানিক এবং ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন যা নিশ্চিত করে যে, কেবল ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন।[১৯] মূলত প্রতীকী নেতা হিসেবে প্রায় প্রতিটি কাজ তাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক করতে হয়।[২০]

৬.২ প্রধানমন্ত্রী

সাংবিধানিক বিধানগুলোর নকশা এবং গঠনের মাধ্যমে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সকল অঙ্গের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এই কেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতরে যেমন সম্প্রীতি নষ্ট করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে ভারসাম্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫[২১] স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, সকল নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে

[১৭] ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।'

[১৮] অনুচ্ছেদ ৭৭(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[১৯] অনুচ্ছেদ ৪৮(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।'

[২০] অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।'

[২১] অনুচ্ছেদ ৫৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ বলা আছে, '(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন,

ন্যস্ত থাকবে। অনুচ্ছেদ ৭০ প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের নেতা হিসেবে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল দলীয় সদস্যদের ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে। হাইকোর্টের বিচারক[২২] এবং অধস্তন আদালতের[২৩] নিয়োগদানও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি করেন। রাষ্ট্রপতি প্রায় সকল কাজই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমের ওপর ন্যায়পালের মাধ্যমে কোনো তদারকির ব্যবস্থাই গড়ে উঠেনি। কার্যকরী ভারসাম্যের অনুপস্থিতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য একটি গুরুতর হুমকিস্বরূপ। প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার এতো ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ তাকে স্বৈরশাসকে পরিণত করেছে।

৬.৩ স্থানীয় সরকার

সুশাসন এবং কার্যকর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেহেতু সংবিধান স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেনি, তাই বিদ্যমান অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরিতার অভাবে ভুগছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা ও ক্ষমতা সাধারণ আইনের কাছে ন্যস্থ করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আমলাতন্ত্রের অধীনে রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধারণ করেন। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। সংবিধানে তাদের মর্যাদা ও কাজের রূপরেখাসহ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসনের স্পষ্ট নির্দেশিকা দিতে হবে।

৬.৪ প্রতিরক্ষা

আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতিকে সুরক্ষা করার পাশাপাশি জাতীয় সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাড়ানোর গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। এটি বোধগম্য যে, একটি শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিয়মকানুন অন্যান্য নাগরিকদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ার কথা[২৪]। তদপুরি, কোনো নিয়মকানুনই একজন মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে না, তা তিনি বেসামরিক নাগরিক হোন বা সৈনিক হোন। সংবিধানে সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া। অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রের মতো, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলাবিষয়ক আইনগুলোর ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক পন্থা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬.৫ আন্তর্জাতিক চুক্তি

যে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি আলোচনা ও স্বাক্ষরের একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখেন প্রধানমন্ত্রী, যা পরে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের কাছে জমা দেওয়া হয়।[২৫] এই জমাদান আনুষ্ঠানিকতা বৈ আর কিছু নয়, কেননা প্রধানমন্ত্রী কোনো খসড়া নয়, বরঞ্চ সাক্ষরিত চুক্তি জমা দেন। সাক্ষরিত চুক্তি জমা দেওয়ার পর এই ধরনের চুক্তি যাচাই-বাছাই করার জন্য সংসদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণে কোনো আইনগত কাঠামোও নেই। ফলে, চুক্তি প্রণয়নের নিয়ন্ত্রণ এবং সেইসাথে চুক্তির বিষয়বস্তু অনেকাংশে অপরীক্ষিত ও ভারসাম্যহীন রয়ে যায়। জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করতে হয়। 'জাতীয় নিরাপত্তা' শব্দটি চুক্তি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি, যা অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে জনসম্পৃক্ততা ও তথ্য জানার অধিকারকে সীমিত করে। এর ফলে, রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী যে চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করেন, সেগুলো সম্পর্কে নাগরিকগণ সাধারণত অবগত থাকেন না। যেহেতু এই চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোনো বিতর্ক সংসদে হয় না, সেহেতু এই অস্বচ্ছতা সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে আরও বিচ্ছিন্ন করে তোলে।

৭. বিচার বিভাগ

৭.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার - এই দুই মৌলিক নীতি পুরো বিচার বিভাগের গড়ন ঠিক করে দেয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। এটি বিচার বিভাগকে বহিরাগত চাপ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করার

সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।'

[২২] অনুচ্ছেদ ৯৫। (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

[২৩] অনুচ্ছেদ ১১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।'

[২৪] অনুচ্ছেদ ৪৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ: 'কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।'

[২৫] অনুচ্ছেদ ১৪৫ক।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এ 'বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরুপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।'

নিশ্চিয়তা প্রদান করে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত নিয়োগ, মেয়াদ এবং সামগ্রিক স্বাধীনতা এমনকিছু সমস্যাকে তুলে ধরে যা উচ্চতর ও অন্যান্য আদালতের সততা এবং কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। ন্যায়বিচার প্রাপ্তি যেন একটি অধরা স্বপ্নই রয়ে গেছে। সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক কাঠামো এমন যে তা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগণকে আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে, কেননা এটা তাদের সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে।

৭.২ প্রধান বিচারপতি

৭.২.১ বাংলাদেশে প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।[২৬] এই ব্যতিক্রমী নজিরের বাস্তবিক কোনো তাৎপর্য নেই, কেননা সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পছন্দসই ও বিশ্বস্ত দলীয় প্রার্থীই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। কার্যত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতি কখনো প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করেননি।

৭.২.২ বিগত কয়েক দশক যাবত প্রধান বিচারপতি নিয়োগে বিচার বিভাগে, বিশেষত আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে, ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। সংবিধানে প্রধান বিচারপতি নির্বাচনের কোনো নির্দেশনা নেই, যদিও প্রথাগত ভাবে আপিল বিভাগের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বিচারককে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অতীতে, বিশেষ করে সম্প্রতি, এই প্রথা একাধিকবার লঙ্ঘন করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা বা মেধার ভিত্তির বিপরীতে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং আনুগত্যের বিবেচনায় প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের কারণে একাধিক বিচারক বেঞ্চে বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ২০১৮ সালে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি মোঃ আবদুল ওয়াহাব মিয়াকে বাদ দিয়ে যখন বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসাইনকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলো, তখন বিচারপতি ওয়াহাব মিয়া পদত্যাগ করেন। একইভাবে ২০২১ সালে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি ইমান আলীকে বাদ দিয়ে যখন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, তখন বিচারপতি ইমান আলী ছুটিতে চলে যান এবং আর কাজে ফিরে আসেননি। সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি ওয়াবদুল হাসানকে হাইকোর্ট বিভাগের ২১ জন বিচারককে টপকিয়ে আপিল বিভাগে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকলে বিচার বিভাগকে ক্রমাগত নির্বাহী বিভাগের প্রভাবের অধীনে থাকতে হবে।

৭.৩ সুপ্রিম কোর্ট

৭.৩.১ **বিচারক নিয়োগ:** হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারকরা নিয়োগ পান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ এর অধীনে এবং অনুচ্ছেদ ৯৮ রাষ্ট্রপতিকে দুই বছর মেয়াদে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের এখতিয়ার প্রদান করে। যদিও এই প্রক্রিয়াতে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করা জরুরি, তবু অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ উল্লিখিত প্রধানমন্ত্রীর মতামতের প্রাধান্য বিচারবিভাগের পরামর্শমূলক ভূমিকাকে ক্ষুণ্ণ করে। যদিও বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বাংলাদেশ বনাম ইদ্রিসুর রহমান মামলায়[২৭] রায় দিয়েছিলেন যে, ৯৫(১) অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারকদের নিয়োগে প্রধান বিচারপতির মতামতকে পরামর্শের অংশ হিসেবে প্রধান্য দিতে হবে কিন্তু, রাষ্ট্রপতি এই মতামতের ভিত্তিতে কাজ করছেন কিনা তা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক নিয়োগে সংবিধানে স্পষ্টত নির্দেশিকার অনুপস্থিতি এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। এটি এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করে যেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

৭.৩.২ **পদোন্নতির ভিত্তি:** সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে পদোন্নতি সাধারণত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে করা হয়। তবে, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মতোই, বিচারকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকেই গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আনুগত্য নিশ্চিত করা হয় এবং বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালের মে মাসে বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম এবং বিচারপতি কাশেফা হোসেনকে ৩৫ জন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে পাশ কাটিয়ে আপিল বিভাগে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

৭.৪ অধস্তন আদালত

৭.৪.১ অধস্তন শব্দটি বিচার বিভাগের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করে চলছে, যা ব্যাপকভাবে অপছন্দনীয়। সহকারী বিচারক থেকে শুরু করে প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত সকল বিচারকই তাদের বিচারিক কার্যক্রমে স্বাধীন এবং কেউ কারোর অধস্তন নয়। এই শব্দের একটি উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

---

[২৬] অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[২৭] বাংলাদেশ বনাম ইদ্রিসুর রহমান ১৫ (২০১০) বি.এল.সি. (এডি) ৪৯

৭.৪.২ **নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ:** অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ প্রধানত রাষ্ট্রপতির অধীনে রয়েছে।[২৮] কিন্তু, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান বিচারকদের স্বাধীনতার প্রশ্নে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই কর্তৃত্ব সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীতে এই নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করে এবং এরপর থেকে এটি কেউ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এমনকি ১৫তম সংশোধনী ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত হলেও, তৎকালীন সংসদ এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

৭.৫ বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মজবুত করতে বিচার বিভাগের জন্য একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাসদার হোসেন মামলা[২৯] নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচার বিভাগের কার্যকরী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। এমন একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং অধিক স্বায়ত্তশাসিত বিচারিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

৮. সংশোধনী

৮.১ বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন[৩০] প্রক্রিয়া শুরু থেকেই গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে । ১৯৭২ সালে সংবিধানের সংশোধনের জন্য সংসদের সকল সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। ১৯৭৩ সালে[৩১] মৌলিক অধিকারে প্রভাব ফেলতে সংশোধনী অনুচ্ছেদে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে[৩২] একটি দুই-পর্যায়ের অনুমোদন পদ্ধতি সন্নিবেশিত করা হয়, যেখানে সংসদের সকল সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং কিছু নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য গণভোট বাধ্যতামূলক করা হয়। ২০১১ সালে গণভোটের বাধ্যবাধকতা বিলোপ করা হয় এবং বর্তমানে সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য কেবল সকল সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।

৮.২ অনুচ্ছেদ ৭(খ)[৩৩] সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করেছে। সংবিধান একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল দলিল, যা সময়, পরিস্থিতি ও সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে বিকশিত হয়। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধানকে সংশোধনের অযোগ্য করার মধ্যমে বিচার বিভাগ কর্তৃক সংবিধানের সময় উপযোগী ব্যাখ্যার সক্ষমতাকেও বাধাগ্রস্থ করবে। সংবিধান জনগণের চাহিদার পরিবর্তন ও প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন থাকা এবং একটি সংসদ অনির্দিষ্টকালের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর কোনো প্রকার অপরিবর্তনীয় বিধান চাপিয়ে দিতে পারে না।

৮.৩ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংশোধনী

৮.৩.১ **দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৭৩):** পাকিস্তানি জান্তার সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ১৯৭২ সালের সংবিধানে কোনো জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়নি, যা গণপরিষদ বিতর্কে প্রশংসিত হয়েছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে কিছু দমনমূলক ও অগণতান্ত্রিক বিধান গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন, নিবর্তনমূলক আটক এবং জরুরি অবস্থা বিধান যা খোদ সংবিধান প্রণেতাদের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী ছিল পরবর্তী সংশোধনীসমূহের মাধ্যমে গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ। সংবিধানের; দ্বিতীয় সংশোধনীর কিছু বিধান চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদন বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।[৩৪]

৮.৩.২ **চতুর্থ সংশোধনী (১৯৭৫):** চতুর্থ সংশোধনী কার্যত সংবিধানকে পুনর্লিখন করেছিল। সংবিধানে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল যা দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছিল, জনগণের কণ্ঠরোধ করে তাদের এক ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গসমূহের সকল ধরনের ভারসাম্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে

[২৮] অনুচ্ছেদ ১১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[২৯] সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় বনাম মাসদার হোসেন (১৯৯৯) ৫২ ডিএলআর (এডি) ৮২

[৩০] অনুচ্ছেদ ১৪২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৩১] সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

[৩২] দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৮, দ্য সেকেন্ড প্রক্লেমেশন আদেশ নং IV, ১৯৭৮, সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন ১৯৭৯ দ্বারা সংশোধিত । এই বিধানটিতে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন ১৯৯১ দ্বারা গণভোটের মাধ্যমে সংশোধন যোগ্য অনুচ্ছেদের সংখ্যা আরো কমাতে সংশোধন করা হয়েছিল।

[৩৩] অনুচ্ছেদ ৭খ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান: 'সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।'

[৩৪] রিট পিটিশন নং ৯১১৮, ২০০৮

রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; সংসদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে সীমিত করা হয়; সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার সংকুচিত করে মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা এবং বাস্তবায়ন আইন প্রণেতাদের ইচ্ছাধীন করা হয়; রাষ্ট্রপতিকে একদলীয় ব্যবস্থা গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে কেবলমাত্র 'জাতীয় দল' নামে একটি দল গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাকশাল গঠন করেন। একটি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে বাকশাল ব্যতীত অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। জরুরি অবস্থা জারি করে অন্যান্য সকল দলকে জাতীয় দলে যোগদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। সংবিধানের এই সংশোধনী কার্যত জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং জাতির ইতিহাসের গতিপথকে পরিবর্তন করে দেয়।

৮.৩.৩ **পঞ্চম (১৯৭৯) এবং সপ্তম (১৯৮৬) সংশোধনী:** এই সংশোধনীসমূহের মাধ্যমে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ – ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ – ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ মধ্যকার সকল সামরিক ঘোষণাপত্র, আইন, আদেশ, বিধি ও অন্যান্য আইনের বৈধতা বা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্ট পঞ্চম সংশোধনী[৩৫] এবং সপ্তম সংশোধনী[৩৬] দুটোকেই অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। এই দুই সংশোধনী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হওয়ার নাগরিক অধিকার দমন করে সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নজির।

৮.৩.৪ **অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮):** অষ্টম সংশোধনী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম[৩৭] হিসেবে ঘোষণা দেয়, এবং সারাদেশে ন্যায়বিচারের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকার বাইরে অন্যান্য শহরে স্থায়ী হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার[৩৮] অনুমতি দেয়। হাইকোর্ট বিভাগের আসন সংক্রান্ত মূল অনুচ্ছেদ ১০০ এর পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং আপিল বিভাগ[৩৯] অনুচ্ছেদ ১০০ এর সংশোধনীকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা দেন। রাজধানী ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ গঠনে বাধা সৃষ্টি করায় এই রায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর পুরো ভিত্তি পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে, কেননা ন্যায়বিচার প্রাপ্তি আর কোনো প্রত্যাশা নয়, বরঞ্চ এটি একটি অধিকার। কিছু লোকের অসুবিধার কারণে বা কিছু কৃত্রিম নীতির আড়ালে এই অধিকারকে অস্বীকার করা যাবে না।

৮.৩.৫ **ত্রয়োদশ সংশোধনী (১৯৯৬):** ত্রয়োদশ সংশোধনী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টা এবং সর্বোচ্চ ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত হতো। উপদেষ্টাগণ সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন এবং নতুন সংসদ গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্তি হয়ে যেতো। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনকারী ১৩তম সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।[৪০] উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটি রিভিউ পিটিশন বর্তমানে আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।

৮.৩.৬ **পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১):** পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান কার্যত চতুর্থ সংশোধনীর মতো পুনর্লিখিত হয়েছে এবং সংবিধানের অনেক মূল বিষয় ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আইনের শাসনের পাশাপাশি সাংবিধানিক মূল্যবোধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সংবিধানে একজন ব্যক্তি ও তার উত্তরাধিকারকে সবার উপরে স্থান দিয়ে গণতান্ত্রিক রীতির বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে যা জনগণের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে স্বৈরাচারী শাসনের প্রাতিষ্ঠিকীকরণ এবং রাজতান্ত্রিক প্রতীকী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে। সংশোধন অযোগ্য বিধানের অন্তর্ভুক্তি, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপিয়ে দেওয়ার নজির। যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল, তার বিলুপ্তি জনগণের ভোটাধিকার ও এর মূল্যবোধকে কার্যত রুদ্ধ করে দিয়েছে। জাতিকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিমজ্জিত করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী ভাবে পাকাপোক্ত করার জন্য আরও ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে।

৮.৩.৭ **ষষ্ঠদশ সংশোধনী (২০১৪):** বিচারক অপসারণ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দৃশ্যত যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। যদিও অনেক দেশ সংসদের মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, বাস্তবে সেই সব দেশের সংসদ বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের ষষ্ঠদশ সংশোধনী কোনো সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যতিরেকে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা

[৩৫] খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি, বিএনপি এবং অন্য বনাম বাংলাদেশ ইতালীয় মার্বেল ওয়ার্কস এবং অন্যান্য ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮

[৩৬] সিদ্দিক আহমেদ বনাম বাংলাদেশ (২০১৩) ৬৫ ডিএলআর (এডি) ৮

[৩৭] অনুচ্ছেদ ২ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৩৮] অনুচ্ছেদ ১০০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৩৯] আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ (১৯৮৯) বিএলডি (এডি) (বিশেষ) ১

[৪০] আব্দুল মান্নান খান বনাম বাংলাদেশ (২০১১) ৬৪ ডিএলআর ১৬৯

সংসদ সদস্যদের হাতে ন্যস্ত করে। এ ধরনের ক্ষমতা অনিবার্যভাবে অপসারণ প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং সংসদের মাধ্যমে বিচারকদের উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সুপ্রিম কোর্ট[৪১] সংবিধানের (ষষ্ঠদশ সংশোধনী) আইন ২০১৪-কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করেছে।

৮.৪ গণভোট

সংবিধান মানুষের জীবনে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। সংবিধানকে যেমন সুরক্ষিত রাখতে হয়, তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে উপযোগী করেও রাখতে হয়। সংবিধান যেহেতু জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ, সেহেতু একে কেবল জনগণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা প্রতিফলিত করার জন্যই পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় কেবল ৩০-৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও একটি দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে যেতে পারে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়াই সংবিধান পরিবর্তনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। চতুর্থ এবং পঞ্চদশ সংশোধনী সংবিধানের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছামাফিক পরিবর্তন থেকে সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলো রক্ষার জন্য সংবিধানের অভ্যন্তরে কিছু অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গণভোটের বিধান নাগরিকদের সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়াতে রায় জানানের সুযোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করার একটি অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রদান করে। গণভোট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংহত করে কেননা এটা জনগণকে ক্ষমতায়িত করে এবং সম্ভাব্য অপব্যবহার থেকে সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে, গণভোট ব্যবস্থা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে বাতিল করা হয়েছে।

৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকার

পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির ফলে সৃষ্ট তীব্র রাজনৈতিক শূন্যতা ও স্থায়ী সংকট এই ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অধিক যৌক্তিকতা প্রদান করে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর অবিশ্বাস, অনাস্থা ও গভীর বিভাজন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি সাধারণ ঐক্যমত রয়েছে যে, স্বাধীনতার পর থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো রাজনৈতিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে অধিক নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি পদক্ষেপ। যে কারণে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, অর্থাৎ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, তা ব্যহত করাই ছিল এই বিলুপ্তির উদ্দেশ্য। যদিও সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে, কিন্তু, যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলের রায়কে প্রভাবিত করা হয়েছিল তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

১০. অন্যান্য বিষয়সমূহ

১০.১ সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ

সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ[৪২] জনগণের কণ্ঠ রোধ করার জন্য সংযোজন করা হয়েছিল। এটি ২০০৯-২০২৪ সালে ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যকলাপে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এটি মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের বরখেলাপ। নাগরিকরদের স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি রাখা তাদের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার; জনগণের এমন দ্রোহের অনিবার্যতা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। নাগরিকদের স্বাধীনতার ওপর সাংবিধানিক খড়্গ আরোপ করার মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠস্বর দমনে উৎসাহ প্রদান করা হয়, যা সংবিধানের মূল ভিত্তি – জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ – এর সাথে সাংঘর্ষিক।

১০.২ ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার[৪৩] ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দ্বারা ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত হয়েছে। জবাবদিহিতা এবং এই সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনার অভাবের ফলে এটি ঘটে থাকে। এই বিধান কার্যত নির্বাহী বিভাগকে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রদান করে, যার ফলে

---

[৪১] বাংলাদেশ বনাম অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান ৭১ ডিএলআর ৫২

[৪২] অনুচ্ছেদ ৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -
(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা
(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।
(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-
(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা
(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

[৪৩] অনুচ্ছেদ ৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষমা প্রদর্শন এবং অভ্যাসগত অপরাধীদের [habitual offenders] মুক্তি প্রদানের ঘটনা ঘটে। এটি জননিরাপত্তা এবং আইনের শাসন নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করে। হত্যার মতো গুরুতর অপরাধে দোষী ব্যক্তিরা এই বিধানের আওতায় মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সংবাদও পাওয়া গিয়েছে।

১০.৩ জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিধান

১০.৩.১ গণপরিষদের বিতর্ক[৪৪] থেকে স্পষ্ট হয় যে গণপরিষদ নিবর্তনমূলক আটক এবং জরুরি অবস্থার বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়নি। এটাকে অগণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে, দ্বিতীয় সংশোধনীর[৪৫] মাধ্যমে এই বিধানগুলোকে বর্তমান সংবিধানে তাদের পথ তৈরি করেছে, যেখানে সংবিধান প্রণয়নের মাত্র এক বছরের মধ্যেই জরুরি অবস্থার বিধান সংযোজন করা হয়। যদিও এই অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, পরবর্তীতে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল।

১০.৩.২ জরুরি অবস্থার সময় জনগণ আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে, কেননা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তখন স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বেশি ক্ষমতা পেয়ে যান, যা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। জরুরি অবস্থার সময় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার[৪৬] (যেমন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪২-এ বর্ণিত) সীমিত বা বাতিল করে রাষ্ট্রকে আরও ক্ষমতায়িত করা নির্মম এবং অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এই সময়েই এই অধিকারগুলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি থাকে। কোনো সাংবিধানিক বিধান মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলি কেড়ে নিতে পারে না। আমাদের সংবিধান এই অধিকারগুলো সৃষ্টি করেনি, বরঞ্চ এটি কেবল সেগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা নাগরিকদের ভোগ করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। জরুরি অবস্থায় কোনো অধিকার সংকুচিত করা কেবল ন্যায়বিচারের সকল নীতি-বিরুদ্ধই নয়, এটি মানব জীবনের মৌলিক মূল্যবোধেরও বিরোধী।

১০.৩.৩ সংবিধানের জরুরি অবস্থা বিধান জনগণের অধিকারকে কেবল সীমিতই করেনি, বরঞ্চ সে সময়ে তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আদালতে যাওয়ার সুযোগও সঙ্কুচিত করেছে।[৪৭] এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আদালতের বিচারিক ক্ষমতা সংকুচিত করা যবে না এবং সংবিধানে জরুরি অবস্থার ক্ষমতার আড়ালে কোনো নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

---

[৪৪] উপরে পাদটীকা ৭৩ দেখুন

[৪৫] অনুচ্ছেদ ১৪১ক

[৪৬] অনুচ্ছেদ ১৪১খ। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরী-অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।

[৪৭] অনুচ্ছেদ ১৪১গ। (১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার [কার্যকরতা-কালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি] আদেশের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লেখিত এবং সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং আদেশে অনুরূপভাবে উল্লেখিত কোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতে বিবেচনাধীন সকল মামলা জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে কিংবা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতর কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।
(২) সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুপারিশসমূহ

প্রস্তাবনা

কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় মুক্তির লক্ষ্যে এই ভূখণ্ডের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে প্রতিফলিত করতে হবে। একইসাথে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের প্রতিফলন ও স্বীকৃতি অবশ্যই প্রস্তাবনায় থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদ গ্রহণ করা হোক।

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, যারা এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি;

আমরা সকল শহীদের প্রাণোৎসর্গকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অঙ্গীকার করছি যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের যে আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার যে আদর্শ ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করেছিল, সেই সকল মহান আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে;

আমরা জনগণের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্রকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করছি, যে সংবিধান বাংলাদেশের জনগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এবং যে সংবিধান স্বাধীন সত্তায় যৌথ জাতীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করবে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার সংরক্ষণ করবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে পরস্পরের প্রতি অধিকার, কর্তব্য ও জবাবদিহিতার চেতনায় সংঘবদ্ধ করবে, সর্বদা রাষ্ট্র পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার নীতিকে অনুসরণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখবে;

জনগণের সম্মতি নিয়ে আমরা এই সংবিধান জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করছি।

নাগরিকতন্ত্র (বর্তমানে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত)

রাষ্ট্র:

১. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় ব্যবহৃত 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো পরিবর্তনের সুপারিশ করছে কমিশন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ও শাসকদের জমিদারসুলভ আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে "প্রজাতন্ত্র" শব্দটির মাঝে। সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে, শব্দগত বিভ্রান্তি এড়াতে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।

রাষ্ট্রধর্ম:

২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রধর্মের বর্তমান বিধান বহাল রাখা হোক। এ বিষয়ে অংশীজন ও কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রধর্ম বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে এই বিধানটি বহাল রাখা হোক। তবে, এ ব্যাপারে কমিশন সদস্যরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে **'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'/আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু'** অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

ভাষা:

৪. কমিশন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে-

"নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা 'বাংলা'। সংবিধান বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।"

প্রতিকৃতি প্রদর্শন:

৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক বিধান (বিদ্যমান সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত করা হোক। এরূপ বিধান ব্যক্তি বন্দনাকে উৎসাহিত করে, স্বৈরতন্ত্রের পথ সুগম করে। 'বাংলাদেশ' অগণিত বরেণ্য মানুষের নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ ও অবদানের সামষ্টিক ফসল। এই রক্তস্নাত মাতৃভূমিতে একক ব্যক্তিকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা বাস্তবতা নেই।

নাগরিকত্ব:

৬. 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...' কমিশন এই বিধানটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হোক: -

"বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন।"

বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) বাংলাদেশের জনগণকে একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে, অর্থাৎ বাঙালি হিসেবে পরিচিত করে। এর ফলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অবহেলিত এবং উপেক্ষিত বোধ করতে পারে।

সংবিধান বিলুপ্তি, স্থগিতকরণ ইত্যাদির অপরাধ:

৭. কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। অনুচ্ছেদ ৭ক সংবিধান সমালোচনার অধিকারকে সীমিত করে এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। এই বিধান অনুসারে সংবিধানের সমালোচনা করাও সংবিধানের প্রতি নাগরিকদের 'আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয়' পরাহত হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধানের পরিবর্তনযোগ্যতা:

৮. কমিশন বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বিধানকে চিরকালের জন্য 'সংশোধন-অযোগ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমন বিধান আইনগতভাবে অযৌক্তিক, কারণ এটি ভবিষ্যতের সংসদকে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। উপরন্তু এই বিধান সংবিধানের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তি:

৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার আদর্শ সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিল। অধিকন্তু, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদ অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সুতরাং, কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে -

> "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"

রাষ্ট্রের মূলনীতি:

১০. কমিশন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এবং এর সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়ার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান সংবিধানে 'জাতীয়তাবাদ' কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর 'ভাষা ও সংস্কৃতি'-কে গুরুত্ব দেয় যার ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠী প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়। সমাজতন্ত্র বর্তমানে বৈশ্বিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং অতীতে ফ্যাসিবাদী শাসনের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এটি বাংলাদেশের বিদ্যমান বহুত্ববাদী সমাজের ধারনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিলুপ্তকরণ:

১১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি), ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা), ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা), ১৮ (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা), ১৮ক (পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন), ১৯ (সুযোগের সমতা), ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম), ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি), ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি) এবং ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি) বিলুপ্ত করা হোক। এই বিধানগুলো প্রস্তাবিত 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' শিরোনামের অধীনে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৬, ২১, ২২ ও ২৫ তাদের বর্তমান রূপে সংবিধানের পুনর্বিন্যস্ত প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হলো।

১২. প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে:

প্রাসঙ্গিক প্যারা	সংস্কার প্রস্তাব	বিদ্যমান সংবিধানের বিধানসমূহ
১.	রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন	অনুচ্ছেদ ১
২-৩	রাষ্ট্রধর্ম	অনুচ্ছেদ ২ক
৪.	রাষ্ট্রভাষা	অনুচ্ছেদ ৩
৫.	জাতরি পিতার প্রতিকৃতি	অনুচ্ছেদ ৪ক
৬.	নাগরিকত্ব	অনুচ্ছেদ ৬
৭.	সংবিধান বাতিল, স্থগীতকরণ ইত্যাদি অপরাধ	অনুচ্ছেদ ৭ক
৮.	সংশোধন অযোগ্য বিধানাবলী	অনুচ্ছেদ ৭খ
৯-১০.	রাষ্ট্রের মূলনীতি	নতুন অনুচ্ছেদ প্রবর্তন হবে
১০	জাতীয়তাবাদ	অনুচ্ছেদ ৯
১০	সমাজতন্ত্র	অনুচ্ছেদ ১০
১০	ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা	অনুচ্ছেদ ১২

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা হোক।

২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাগুলো সংবিধানের প্রথম ভাগে স্থানান্তরিত হোক।

৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'আইনের সমান সুরক্ষার' পরিধি সম্প্রসারণ করে 'আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা' (নাগরিকদের পরিবর্তে সকল ব্যক্তির জন্য) অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে অননুমোদিত বৈষম্যের যে সীমিত তালিকা আছে, তা পরিবর্তন করে এমন একটি তালিকা করা হোক যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গায়ের রং, নৃগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, জন্মস্থান-এই সবসহ আরও অনেক কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার রক্ষা নিয়ে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ থাকবে, যা রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থাসমূহ কর্তৃক বেআইনি কাজ, যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সংবিধানে শারীরিক অখণ্ডতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষার বিধান সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করা হোক।

৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা বিচার ও দণ্ড এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, দাসত্ব, বশ্যতায় আবদ্ধ রাখা এবং জবরদস্তি শ্রম বিষয়ক বর্তমান অনুচ্ছেদটি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক একটি নতুন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হোক।

৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মানব পাচার, যৌন পাচার এবং শোষণের সকল রূপ, যার মধ্যে চোরাচালান, শোষণ এবং দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত, প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক।

৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে অবহিত হওয়ার অধিকার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, সময়মতো বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার, এবং অসাংবিধানিক বা বেআইনি উপায়ে প্রাপ্ত প্রমাণ বাতিল করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে না, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের মালিকানা গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা একচেটিয়া হতে দেবে না।

১১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হোক, যা ইন্টারনেট প্রাপ্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করবে এবং সকল নাগরিকের জন্য যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

১২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, তথ্য পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক, যাতে জনগণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান করতে পারে এবং কাউকে কোনো দল বা সংগঠনে যোগদান করতে বা বিরত রাখতে না পারে।

১৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি বিস্তারিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধর্ম পালন, প্রচার, প্রসার এবং প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

১৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিদেশী খেতাব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা হোক।

১৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হোক।

১৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সমবায়ী-এই বিভিন্ন প্রকার মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

১৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ব্যক্তি ও জনপরিসর উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে।

১৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হোক। রাষ্ট্রকে অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষা সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

২০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের আওতায় একটি বলবৎযোগ্য স্বাস্থ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। রাষ্ট্রকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল নাগরিকের জন্য জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

২১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, যথাযথ, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার ও পানযোগ্য পানি এবং পয়োনিষ্কাশনের অধিকার রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

২২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বাসস্থানের অধিকার বলবৎযোগ্য করা হোক, যাতে যথাযথ, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

২৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

২৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

২৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের মাধ্যমে সম্মানজনক ও সুরক্ষিত কাজের অধিকারকে বলবৎযোগ্য করা হোক।

২৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।

২৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।

২৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এমন অধিকার যোগ করা হোক যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে- বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ, ইশারা ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ এবং তাদের প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যুক্তিসঙ্গত প্রাপ্তির সুযোগ।

২৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে-নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে টিকা, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।

৩০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।

৩১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

৩২. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩৩. কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

৩৪. কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তি শ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।

৩৫. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা হোক।

৩৬. কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টভাবে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৩৭. কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।

৩৮. কমিশন সুপারিশ করছে যে, মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা হোক। এবং এক্ষেত্রে আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত প্রতিকার ও শাস্তি প্রদান করবে।

৩৯. কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নেবর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে:

(ক) আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না;

(খ) আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না;

(গ) আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না;

(ঘ) এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং

(ঙ) এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

৪০. কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে, এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে:

(ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই;

(খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান-বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

(গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।

আইনসভা

১। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা বিরাজ করেছে। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ক্রমশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। নির্বাহী কার্যাবলি তদারকির অকার্যকারিতা, দুর্বল প্রতিনিধিত্ব এবং বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে আইনসভা যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর ক্রমাগত সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির কারণে জবাবদিহির জায়গাটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

২। কমিশন আইনসভা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করছে:

আইনসভার গঠন - দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

সুপারিশ

৩। কমিশন সুপারিশ করছে যে বাংলাদেশে নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষের (সিনেট) সমন্বয়ে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা থাকবে। উচ্চকক্ষ আইনি যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এবং নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। এর ফলে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং আইন প্রণয়নসহ সকল বিষয়ে সীমিত বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতির অবসান ঘটবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সংসদে নাগরিকদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়ানুগ নীতি প্রণয়নের জন্য সহায়ক হবে।

নিম্নকক্ষের গঠন ও কার্যকাল, স্থায়ী কমিটির কার্যপ্রণালি এবং সংসদ সদস্যদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হলো।

নিম্নকক্ষ

গঠন:

৪। সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট, অর্থাৎ, ফার্স্ট পাস্ট দ্য-পোস্ট (FPTP) নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ, জাতীয় সংসদ, গঠিত হবে। কমিশন FPTP নির্বাচনী পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করেছে, কারণ এটি স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে, যা আমাদের মতো একটি নাজুক গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫। মোট ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ (একশ) জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০ (একশ) টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

৬। কমিশন নিম্নকক্ষে নারীদের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

৭। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করবে।

৮। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স হবে ২১ (একুশ) বছর।

৯। দুজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাঁদের মধ্যে একজন বিরোধী দলের সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

মেয়াদ:

১০। নিম্নকক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

দলের বিপক্ষে ভোটদান:

১১। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্য তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

স্থায়ী কমিটিসমূহ:

১২। আইনসভার যথাযথ তত্ত্বাবধান ও শাসন নিশ্চিত করার জন্য সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন প্রস্তাব করছে যে, এই কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। এর ফলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর ওপর ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব কমিয়ে দলনিরপেক্ষ সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি তৈরি করা সম্ভব হবে এবং কমিটির লক্ষ্য ও স্বার্থ বাস্তবায়ন করাও সহজতর হবে। অধিকন্তু, স্বার্থের সংঘাত এড়াতে কঠোর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। এসব নীতিমালায় সদস্যদের ব্যক্তিগত, আর্থিক বা পেশাগত যেকোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। এবং এইরূপ স্বার্থ থাকলে ওই সদস্যরা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

সংসদ সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ

১৩। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। এর ফলে এক ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং কর্তৃত্ববাদ রোধ করা সহজতর হবে।

উচ্চকক্ষ:

সুপারিশমালা

গঠন:

১৪। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চকক্ষ নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

(ক) উচ্চকক্ষ 'সিনেট' নামে অবিহিত হবে।

(খ) উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশত পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(গ) রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ (একশত) জন প্রার্থী মনোনীত করবে।

(ঘ) সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের মোট প্রাপ্ত ভোট একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হবে।

(ঙ) এই ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

(চ) অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য নন) ৫ জন প্রার্থী মনোনীত করবেন।

(ছ) কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে।

(জ) রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠন করলেও জোটের যে সব শরীক নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে আলাদাভাবে ন্যূনতম ১ (এক) শতাংশ ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁরা উচ্চকক্ষের আসনের জন্যে বিবেচিত হবে।

(ঝ) উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

(ঞ) উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত উচ্চকক্ষের অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

(ট) উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিম্নকক্ষের সদস্যদের মতোই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

উচ্চকক্ষ তার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সংবিধানে উল্লেখিত কমিটিসহ প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন করবে।

মেয়াদ:

১৫। উচ্চকক্ষের কার্যকাল হবে নিম্নকক্ষের সমান, অর্থাৎ চার বছর। নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দেওয়া হলে উচ্চকক্ষও ভেঙ্গে যাবে।

১৬। যেহেতু পিআর পদ্ধতি প্রাপ্ত ভোটের যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিফলন ঘটায়, সেহেতু কমিশন উচ্চকক্ষে আসন বণ্টনের জন্য এই পদ্ধতির সুপারিশ করছে। পিআর (PR) পদ্ধতির ফলে ছোট দল ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকতর অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব, যা বৈচিত্র্যময় প্রতিনিধিত্বকে (diverse representation) উৎসাহিত করবে। বিস্তারিত পরিসরে মতামত উপস্থাপিত হলে, সুবিবেচনাপ্রসূত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

উচ্চকক্ষের দায়িত্ব:

সুপারিশমালা

১৭। কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষকে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অর্পণ করা হবে:

ক. আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা:

(ক) উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল ব্যতীত সকল বিল উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে।

(খ) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত নিম্নকক্ষের বিল উচ্চকক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে।

যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে:

(গ) সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে:

(ঘ) সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো, সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(ঙ) নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাসকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিম্নকক্ষ যদি এটি আবারও পরবর্তী অধিবেশনে পাস করে, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

(চ) উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

১৮। সংবিধান সংশোধন:

(ক) কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের সকল সংশোধনীর ক্ষেত্রেই উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(খ) প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

(খ) যদি গণভোটে প্রস্তাবিত সংশোধনীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে, তাহলে রাষ্ট্রপতি উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি প্রদান করবেন।

১৯। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন:

(ক) কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, (অ) বিদেশি রাষ্ট্র, (আ) আন্তর্জাতিক সংস্থা, (ই) বিদেশি সরকার, (ঈ) বিদেশি কোম্পানি, বা (উ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে কোনো চুক্তি নিম্নকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে আইনসভার উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় গোপনীয়তা রক্ষা করে আলোচিত হবে।

(খ) উভয় কক্ষের পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ফলে যেকোনো চুক্তির ব্যাপক পরীক্ষণ সম্ভব, যা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করবে। চুক্তি সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা ও বিবেচনার সুযোগও এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত হয়।

২০। অভিশংসন প্রক্রিয়া:

(ক) রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যেতে পারে।

(খ) লিখিতভাবে নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষরে অভিশংসন প্রস্তাব আনার অভিপ্রায় জানিয়ে নোটিশের মাধ্যমে নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রস্তাবটি নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের কম নয় এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অবশ্যই পাস হতে হবে।

(গ) নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষ অভিশংসন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে সাক্ষ্য–প্রমাণ গ্রহণ করা এবং শুনানি পরিচালনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ।

(ঙ) শুনানি শেষে প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলে উচ্চকক্ষ সাক্ষ্য–প্রমাণ এবং যুক্তি বিবেচনা করবে। রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত অথবা অপসারণ করতে উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।

২১। ন্যায়পাল নিয়োগ

সুপারিশমালা

কমিশন সুপারিশ করছে যে ন্যায়পালের নিয়োগ হবে একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। একজন সাংবিধানিক পদাধিকারী হিসেবে ন্যায়পালের ক্ষমতা হবে মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং সমাধান করা। এর ফলে জনপ্রশাসন ও শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারের কারণে বর্তমান সংবিধানের যেসব বিধান সংস্কার করতে হবে:

প্রাসঙ্গিক প্যারা	সংস্কার প্রস্তাব	বিদ্যমান সংবিধানের বিধান
৩	দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা	অনুচ্ছেদ ৬৫ (১)
৫	নিম্নকক্ষ ৪০০ আসনের সমন্বয়ে গঠিত হবে	অনুচ্ছেদ ৬৫ (২)
৫	সংরক্ষিত ১০০ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন	অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩)
৭	১০% আসনে তরুণ নেতৃত্ব	নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে
৮	নির্বাচনে অংশগ্রহণের বয়সসীমা ২১	অনুচ্ছেদ ৬৬ (১)
৯	দুজন ডেপুটি স্পিকার, তার মধ্যে একজন বিরোধী দলের	অনুচ্ছেদ ৭৪
১০	সংসদের মেয়াদ কমিয়ে চার বছর	অনুচ্ছেদ ৭২ (৩)
১১	দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান	অনুচ্ছেদ ৭০
১২	স্থায়ী কমিটি	অনুচ্ছেদ ৭৬
১৪-১৬	উচ্চকক্ষের গঠন ও মেয়াদ	নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে
১৭	উচ্চকক্ষের দায়িত্ব	নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে
১৮	সংবিধান সংশোধন	অনুচ্ছেদ ১৪২
১৯	আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন	অনুচ্ছেদ ১৪৫ ক
২০	অভিশংসন প্রক্রিয়া	অনুচ্ছেদ ৫২
২১	ন্যায়পাল নিয়োগ	অনুচ্ছেদ ৭৭

নির্বাহী বিভাগ

১. সরকারের প্রকৃতি

১.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

১.২ কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের সুপারিশ করছে যা ৩.৩ (রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং কার্যাবলী) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন।

১.৩ কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] গঠনের সুপারিশ করছে। এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী, বিশেষ করে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ সংস্থার প্রধানদের নিয়োগ সম্পাদন করবে।

২. জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

২.১ এনসিসি গঠন (আইনসভা বহাল অবস্থায়)

২.১.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি-র সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধানমন্ত্রী

(ই) বিরোধীদলীয় নেতা

(ঈ) নিম্নকক্ষের স্পিকার

(উ) উচ্চকক্ষের স্পিকার

(ঊ) প্রধান বিচারপতি

(ঋ) বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ও) বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ঔ) প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন। উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

২.১.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন।

২.২ এনসিসি গঠন (আইনসভা না থাকলে)

২.২.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি এর সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধান উপদেষ্টা

(ই) প্রধান বিচারপতি

(ঈ) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের ২ (দুই) জন সদস্য।

২.২.২ প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সাথে সাথে এনসিসি গঠনে অনুচ্ছেদ ২.১.১ প্রযোজ্য হবে।

২.৩ কার্যাবলী

২.৩.১ নিয়োগ

এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে:

(অ) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(আ) অ্যাটর্নি জেনারেল

(ই) সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঈ) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(উ) মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঊ) প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঋ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান

(এ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।

২.৩.২ এনসিসি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম প্রেরণ করবে।

২.৩.৩ এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আইনসভা আইন দ্বারা এনসিসিকে অতিরিক্ত কার্যভার অর্পণ করতে পারবে।

২.৪ সভা এবং কর্ম পদ্ধতি

২.৪.১ এনসিসি প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি-র ৩ (তিন) সদস্যের লিখিত অনুরোধে রাষ্ট্রপতি জরুরী সভা আহ্বানে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি, এনসিসির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২.৪.২ সংবিধানে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত সিদ্ধান্ত এনসিসির মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নিতে হবে।

২.৪.৩ মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি এনসিসি-র সভার কোরাম হবে।

২.৪.৪ এনসিসি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় রুলস তৈরি করবে।

৩. রাষ্ট্রপতি

৩.১ পদমর্যাদা ও যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকবেন। কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(অ) ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের হন; অথবা

(আ) আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হন; অথবা

(ই) কখনও সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত না হন।

৩.২ নির্বাচন এবং মেয়াদ

৩.২.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে -

(অ) আইনসভার উভয় কক্ষের প্রতিটি সদস্যদের একটি করে ভোট;

(আ) প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' থাকলে ৬৪ টি ভোট];

(ই) প্রতিটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' এর সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট।

৩.২.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমন্বয় কাউন্সিলের সকল সদস্য মিলে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাকে সর্বোচ্চ ভোট দিবেন তিনি একটি ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। একটি সমন্বয় কাউন্সিলের প্রদত্ত ভোটে যদি একাধিক রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট পান, তবে সেই সমন্বয় কাউন্সিলে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে। পুনরায় অনুষ্ঠিত ভোটে সমন্বয় কাউন্সিলের সদস্যগণ শুধুমাত্র সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত পদপ্রার্থীদেরকেই ভোট দিতে পারবেন। সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২.৩ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।

৩.৩ দায়িত্ব এবং কার্যাবলী

৩.৩.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করবেন:

(অ) প্রধান বিচারপতি।

(আ) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক।

(ই) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক।

(ঈ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

(উ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদ।

৩.৩.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার নিয়োগ করবেন।

৩.৪ অভিশংসন

কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভার প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের মাধ্যমে সংবিধানের আইনসভা অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করা যাবে।

৪. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

কমিশন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

৪.১ প্রধানমন্ত্রী

৪.১.১ আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

৪.১.২ নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

৪.১.৩ আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে নিম্নকক্ষের অন্য কোনো সদস্য সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাবে না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ এক সাথে ভেঙে দেবেন।

৪.১.৪ একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনো ভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্যে এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪.২ মন্ত্রীগণ

মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবেন।

৪.৩ আইনসভার সদস্য

কমিশন আইনসভার সদস্য পদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

৪.৩.১ কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪.৩.২ কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি দায়িত্ব ব্যতিরেকে আইনসভা সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

৫. অন্তর্বর্তী সরকার

কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করছে যার কাঠামো, দায়িত্ব এবং মেয়াদ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে -

৫.১ এই সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা' বলে অভিহিত হবেন। যিনি ৫.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।

৫.২ অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

৫.৩ প্রধান উপদেষ্টা

কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে-

৫.৩.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজনকে এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৫.৩.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৪ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবার পর তিনি আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এমন অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করবেন।

৫.৫ কার্যাবলী

অন্তর্বর্তী সরকার সকল রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের ব্যাবস্থা করবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে।

৫.৬ প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুবরণ করলে বা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হারালে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে মনোনীত করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিবেন।

৬. স্থানীয় সরকার

৬.১ ক্ষমতায়ন

৬.১.১ কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

৬.১.২ কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে । এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৬.১.৩ তহবিল ও বাজেট

(অ) এলজিআই ট্যাক্স, চার্জ, ফি ইত্যাদি আরোপ করে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত তহবিল তার বাজেটের বেশি হলে, উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে রাখা হবে।

(আ) যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লিখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেবে।

(ই) আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, আইনসভার একটি নতুন উচ্চকক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিটির সকল কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

৬.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

কমিশন দক্ষ এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে, সকল স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত এলজিআই থাকবে-

(অ) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

(আ) বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ;

(ই) পৌরসভা; এবং

(ঈ) সিটি কর্পোরেশন।

৬.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

কমিশন প্রতিটি জেলায়, একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর অংশ হবে না, কেননা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে। 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর কাঠামো, দায়িত্ব এবং কাজের পরিধি প্রসঙ্গে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে -

৬.৩.১ 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' একটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর নিম্নলিখিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে -

(অ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান

(আ) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র

(ই) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান।

'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যারা প্রত্যেকে এক বছর মেয়াদে কাউন্সিলের সভায় পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৬.৩.২ প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের একটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' থাকবে যা মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও সকল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

৬.৩.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের নিম্নলিখিত কার্যাবলী থাকবে-

(অ) সমগ্র জেলা বা জেলার মধ্যে একাধিক এলজিআই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা এবং এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি এলজিআই থেকে তহবিল বরাদ্দের সমন্বয় করা।

(আ) জেলার অন্তর্গত প্রতিটি এলজিআই-এর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা ও তহবিল সংগ্রহে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

(ই) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উপরোল্লিখিত ৩.২.১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) এর অংশ হিসেবে ভোট প্রদান করা।

(ঈ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সকল কার্য সম্পাদন করা।

৬.৪ নির্বাচন

(অ) কমিশন স্থানীর সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ না করার সুপারিশ করছে।

(আ) কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

৬.৫ স্থানীয় সরকার কমিশন

৬.৫.১ কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

৬.৫.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে, -

(অ) স্থানীয় সরকার কমিশন সকল এলজিআই তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

(আ) স্থানীয় সরকার কমিশনের কাছে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকবে এবং প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরূদ্ধে স্থগিতাদেশ বা অপসারণসহ যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(ই) এলজিআই সমূহের মধ্যে, কিংবা এলজিআই বা কোনো সরকারি বিভাগ কর্তৃক একে ওপরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাসহ অন্য যে কোনো অভিযোগ করলে, স্থানীয় সরকার কমিশনের উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৭. প্রতিরক্ষা

৭.১ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সংবিধানে কোনো ব্যতিক্রম রাখার সুযোগ নেই। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫ সংশোধন করে শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার বিধান যুক্ত করার সুপারিশ করছে। সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্যে শৃঙ্খলা-বাহিনীর প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ আইনি কাঠামো থাকতে পারে বলে কমিশন মনে করে।

৭.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

৭.৩ কমিশন সুপারিশ করছে যে, যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা শুধুমাত্র সংসদের থাকবে। যদি আইনসভা বহাল না থাকে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পতিত হয়, তাহলে এনসিসির এই ক্ষমতা থাকবে। তবে আইনসভা গঠনের পর এনসিসির সিদ্ধান্ত সংসদের প্রথম অধিবেশনে অনুমোদিত হতে হবে।

৮. অ্যাটর্নি জেনারেল

কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে পৃথক স্থায়ী বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসের নেতৃত্বে থাকবেন অ্যাটর্নি জেনারেল। বাংলাদেশের সকল স্তরের আদালতে কর্মরত রাষ্ট্রের প্রত্যেক আইন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসেস অফিস নিয়োগ প্রদান করবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারের কারণে বর্তমান সংবিধানের যেসব বিধান সংস্কার করতে হবে:

প্রাসঙ্গিক প্যারা	সংস্কার প্রস্তাব	বিদ্যমান সংবিধানের বিধান
১.	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হবে
২.	রাষ্ট্রপতি	অনুচ্ছেদ ৪৮-৫৪
৩.	প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা	অনুচ্ছেদ ৫৫-৫৮
৪.	অন্তর্বর্তী সরকার	৫৮খ-৫৮ঙ অনুচ্ছেদ গুলো প্রয়োজনীয় সংশোধনী স্বাপেক্ষে পুনর্স্থাপিত হবে
৫.	স্থানীয় সরকার	অনুচ্ছেদ ৫৯-৬০
৬.	প্রতিরক্ষা	অনুচ্ছেদ ৪৫, ৬১-৬৩
৭.	অ্যাটর্নি জেনারেল	অনুচ্ছেদ ৬৪

বিচার বিভাগ

১। 'ন্যায়বিচারের সুযোগ' (এ্যাকসেস টু জাস্টিস) বলতে বোঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। তবে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে ন্যায়বিচারের সুযোগ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়া এবং তা শুধুমাত্র রাজধানীতে অবস্থান। ফলে দেশের একটি বৃহৎ অংশ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা, আইনি প্রতিকারের জন্যে বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে নিরুৎসাহিত হন।

২। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ, বিচারকদের নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব, সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ, বিচারকদের বিরুদ্ধে দলীয় বিবেচনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট প্রয়োগ এবং পক্ষপাতমূলক বিচারিক সিদ্ধান্তের দ্বারা জর্জরিত হয়েছে - যার সবগুলোই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিকে খর্ব করেছে। যদিও ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দিয়েছিল যে, বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলির প্রশাসনিক কার্যক্রম সরকারের নির্বাহী বিভাগের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে, তবু বিচার বিভাগ এখনো একটি সত্যিকার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি। কেননা, 'অধস্তন আদালত' এখনো নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক, পরিচালন, লজিস্টিক ও অন্যান্য ব্যয়ভারের জন্য নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীলতা এই পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে।

সুপারিশসমূহ

সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:

৩। কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে।

৪। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন স্থায়ী আসন স্থাপন করা হবে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবেই সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ:

৫। কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠনের সুপারিশ করছে। ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে তারা হচ্ছেন:

১. প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান)

২. আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)

৩. হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য)

৪. অ্যাটর্নি জেনারেল

৫. একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)

৬। জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন (জেএসি)-তে একজন নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব কমিশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র তুলে ধরবে।

৭। জেএসি সততা, নিষ্ঠা, মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান, পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্যে যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে যাদেরকে রাষ্ট্রপতি বিচারক হিসেবে নিয়োগ করবেন।

৮. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে এই কমিশন সুপারিশ করছে যে -

যে কোনো একজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; এবং

(ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট থাকেন; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করেন; অথবা

(গ) বাংলাদেশের যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন; এবং

(ঘ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোনো অযোগ্যতা না থেকে থাকলে।

বিচারপতি নিয়োগ:

৯। কমিশন আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করছে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ:

১০। কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি (বর্তমানে যেমন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে) বহাল রাখার সুপারিশ করছে।

তবে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।

সে মর্মে, এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অথবা অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি রাষ্ট্রপতি বা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (এনসিসি) বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, একজন বিচারক নিম্নোক্ত কারণে –

(ক) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার দরুন স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হতে পারেন,

তাহলে রাষ্ট্রপতি অথবা এনসিসি (যা প্রযোজ্য) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে বিষয়টি তদন্ত করে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাতে নির্দেশ দেবেন।

উপরোক্ত তদন্ত নিম্নোক্ত ৩ (তিন) ভাবে সূচনা করা যাবে—

(ক) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন চাইতে পারবে;

(খ) রাষ্ট্রপতি অন্য যে কোনো সুত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবেন;

(গ) এনসিসি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবে;

সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির কাছে কারো বিষয়ে তদন্তের অনুমতি চায় অথবা রাষ্ট্রপতি যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে তদন্তের নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিষয়টি এনসিসি-কে অবহিত করবে।

১১। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অভিযোগ তদন্তের ফলাফল রাষ্ট্রপতি এবং এনসিসি -কে অবহিত করবে।

যদি তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল মতামত দেন যে, বিচারক স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী, তাহলে রাষ্ট্রপতি আদেশবলে বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠতম বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

অধস্তন আদালত:

১২। কমিশন 'অধস্তন আদালত'–এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে। 'অধস্তন আদালত' অভিব্যক্তি আদালতসমূহের মর্যাদা এবং মূল্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

১৩। কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে কমিশন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন

ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে:

অনুচ্ছেদ	সংস্কার প্রস্তাব	বিদ্যমান সংবিধানের সংশোধনযোগ্য বিধানসমূহ
৩	হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ	অনুচ্ছেদ ৯৪, ১০০, ১০২, ১০৭, ১০৯, ১১০
৪	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ	অনুচ্ছেদ ৯৫, ৯৬, ৯৮
৭	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতা	অনুচ্ছেদ ৯৫
৮	প্রধান বিচারপতির নিয়োগ	অনুচ্ছেদ ৯৫
৯	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ	অনুচ্ছেদ ৯৬
১১	অধস্তন আদালতের নাম পরিবর্তন	অধ্যায়ের শিরোনাম; ষষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ-এ "অধস্তন আদালত"; অনুচ্ছেদ ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬
১২	বিচারিক সচিবালয়ের প্রতিষ্ঠা	অনুচ্ছেদ ৮৮, ১১৫, ১১৬

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

বর্তমান সংবিধানে দুটি সাংবিধানিক কমিশনসংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথা নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি কর্ম কমিশন। এই দুটি কমিশনের পাশাপাশি সংবিধান সংস্কার কমিশন (Constitution Reform Commission- CRC) সুপারিশ করছে যে বিদ্যমান মানবাধিকার কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং স্থানীয় সরকার কমিশন নামে একটি নতুন সাংবিধানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হোক।

এই পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন সংবিধানে একটি পৃথক ভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার শিরোনাম হবে **"সাংবিধানিক কমিশনসমূহ"**। এই অংশে প্রতিটি কমিশনের জন্য পৃথক পৃথক পরিচ্ছদ থাকবে, যেখানে কমিশন প্রতিষ্ঠা, কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ, কার্যকাল এবং কমিশনের কার্যাবলি–সম্পর্কিত মূল বিধানগুলো উল্লেখ করা হবে। প্রতিটি কমিশনের অতিরিক্ত বিবরণ পৃথক আইনের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

সিআরসি (CRC) নিম্নলিখিত পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরির সুপারিশ করছে, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে:

১. মানবাধিকার কমিশন

২. নির্বাচন কমিশন

৩. সরকারি কর্ম কমিশন

৪. স্থানীয় সরকার কমিশন

৫. দুর্নীতি দমন কমিশন

সিআরসি সুপারিশ করছে যে, সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রতিটি কমিশনের জন্য সিআরসির সুপারিশগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন একজন প্রধান মানবাধিকার কমিশনার এবং অনূর্ধ্ব চারজন মানবাধিকার কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান আইনে বলা হয়েছে যে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্য পূর্ণকালীন হবেন এবং অন্য সদস্যরা সম্মানসূচক সদস্য হিসেবে কাজ করবেন।[১] সিআরসি সুপারিশ করেছে যে মানবাধিকার কমিশনের সকল সদস্য পূর্ণকালীনভাবে নিয়োগকৃত হবেন।

মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ:

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি মানবাধিকার কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল:

মানবাধিকার কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি:

কমিশন আইন দ্বারা নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করবে। কমিশনের কার্যাবলীর মূল বিষয়গুলি হল: তদন্ত ও অনুসন্ধান; সুপারিশ; আইনি সহায়তা এবং মানবাধিকার বিষয়ক প্রচারণা; মানবাধিকার আইন, নিয়ম এবং অনুশীলনের উপর গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং নীতিনির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

[১] Section 5(2) of the National Human Rights Commission Act 2009.

মানবাধিকার কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ এবং অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে মানবাধিকার কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো মানবাধিকার কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।[২] কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যেম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

নির্বাচন কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের কার্যকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

রাষ্ট্রপতি, সংসদ এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা এবং এসব নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের ওপর অর্পিত থাকবে। কমিশন সংবিধান ও অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করবে:–

(ক) রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের আয়োজন করা;

(খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের আয়োজন করা;

(গ) স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের নির্বাচনের আয়োজন করা;

(ঘ) সংসদ ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা; এবং

(ঙ) রাষ্ট্রপতি, সংসদ ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

নির্বাচন কমিশন সংবিধানে নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এমন কার্য সম্পাদন করবে, যা এই সংবিধান বা অন্য কোনো আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে।

নির্বাচন কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ এবং অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

[২] Article 118(1) of the Constitution.

সরকারি কর্ম কমিশন

সরকারি কমিশন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একজন প্রধান সরকারি কর্ম কমিশনার এবং অনধিক চারজন সরকারি কর্ম কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সরকারি কর্ম কমিশনে নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

সরকারি কর্ম কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) নাগরিকতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের কাছে পাঠানো হলে সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়া; এবং

(গ) আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের এবং কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোনো প্রবিধানের (যা এই ধরনের আইনের সহিত অসমঞ্জস নয়) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন:

(ক) নাগরিকতন্ত্রের কাজের জন্য যোগ্যতা ও ঐ কাজে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) নাগরিকতন্ত্রের কাজে নিয়োগদান, ওই কাজের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতি ও বদলি এবং ওই ধরনের নিয়োগ, পদোন্নতি বা বদলির জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ নাগরিকতন্ত্রের কাজের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এই ধরনের বিষয়াদি; এবং

(ঘ) নাগরিকতন্ত্রের কাজের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

সরকারি কর্ম কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ ও অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো সরকারি কর্ম কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

স্থানীয় সরকার কমিশন

স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার কমিশন একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং অনূর্ধ্ব চারজন স্থানীয় সরকার কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনারগণের নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

স্থানীয় সরকার কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারক এবং নিয়ন্ত্রণসহ আইন দ্বরা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি পালন করবে।

স্থানীয় সরকার কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ ও অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইনের বিধানাবলী অনুসারে কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো স্থানীয় সরকার কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা

দুর্নীতি দমন কমিশন একজন প্রধান দুর্নীতি দমন কমিশনার এবং অনধিক চারজন দুর্নীতি দমন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত একজন নারী থাকতে হবে এবং কমিশনের গঠনে সমাজে বিদ্যমান বহুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনারবৃন্দের নিয়োগ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কাছে মনোনয়ন পাঠালে রাষ্ট্রপতি কমিশনারদের নিয়োগ দেবেন।

কার্যকাল

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারবৃন্দের কার্যের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।

কমিশনের কার্যাবলি

দুর্নীতি সম্পর্কিত অনুসন্ধান করা, তদন্ত পরিচালনা করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা এবং ওই অনুসন্ধান, তদন্ত এবং মামলা দায়ের সহ আইন দ্বারা নির্ধারিত দুর্নীতি বিরোধী অন্য সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

দুর্নীতি দমন কমিশনারগণের চাকরির শর্তাবলি, পদত্যাগ ও অপসারণ

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের বিধানাবলী অনুসারে কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেভাবে নির্ধারণ করবেন, সেই রকম হবে;

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেই ধরনের পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোনো দুর্নীতি দমন কমিশনার অপসারিত হবেন না।

কোনো কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

কমিশন সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করছে। সংবিধানে "বিচার বিভাগ" সংক্রান্ত ভাগের পর আলাদা একটি ভাগে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস সম্পর্কিত বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। "স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস" অংশে মূল বিধান সন্নিবেশিত হবে এবং বিস্তারিত বিষয়াদি আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। সাংবিধানিক বিধানাবলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হোক:

- অ্যাটর্নি সার্ভিস হবে একটি স্থায়ী পেনশনযোগ্য সরকারি চাকরি।
- সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতনকাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধানসংবলিত আইন থাকবে।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট বরাদ্দ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা থাকবে।
- প্রস্তাবিত সার্ভিসের দুটি ইউনিট থাকবে: (ক) সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট ইউনিট এবং (খ) সহকারী জেলা অ্যাটর্নি, সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি, যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং জেলা অ্যাটর্নি সমন্বয়ে গঠিত জেলা ইউনিট।
- চাকরির শর্ত অনুযায়ী জেলা ইউনিটের কর্মকর্তাদের আন্তঃজেলা বদলি, জেলা ইউনিট থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটে বদলি ও পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।
- সুপ্রিম কোর্ট ইউনিট থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন অ্যাটর্নি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক, আর্থিক, অবকাঠামো এবং সহায়ক জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের একটি পৃথক ইউনিটের ওপর।
- জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসে কর্মরত সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটর প্রতিটি তদন্তযোগ্য মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।
- প্রসিকিউটর কর্তৃক তদন্ত তত্ত্বাবধান বা মামলা পরিচালনায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

যৌক্তিকতা

সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন প্রস্তাবের পক্ষে তথ্য ও যুক্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলায় জড়িত পক্ষগণের ধরন বিচারে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

- অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে।
- দেওয়ানি মামলাসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশে সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকে।
- হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় সকল মামলায় সরকার পক্ষভুক্ত থাকে।

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদকে একটি সাংবিধানিক পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূলত সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু তাঁকে সহায়তা করার জন্য তিনটি স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলেও তাঁদের বিষয়ে সংবিধানে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোতে সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য তিনটি স্তরের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দুটি স্তরের গভর্নমেন্ট প্লিডার রয়েছেন।

এযাবৎ অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সকল স্তরের আইন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং অপ্রতুল আইনি কাঠামোর আওতায়। আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে জবাবদিহির কোনো আইনি কাঠামো নেই। যোগ্যতা বা দক্ষতা বা সততা নয়, মূলত আইন কর্মকর্তাগণের নিয়োগকে বিবেচনা করা হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে।

সম্প্রতি নির্মিত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ব্যতীত জেলা পর্যায়ে কোনো আইন কর্মকর্তার জন্য পৃথক অবকাঠামো, সহায়ক জনবল, বাজেট বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার সাথে আইন কর্মকর্তাদের

মতামত গ্রহণ বা গুরুত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। জেলা পর্যায়ের আইন কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক অতি নগণ্য। কমিশনের সাথে মতবিনিময়ের সময় ঢাকা জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এবং গভর্নমেন্ট প্লিডার (জিপি) জানান যে তাঁদের মাসিক সম্মানী/পারিশ্রমিক মাত্র ১৫ হাজার টাকা।

সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠন প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। এরূপ অ্যাটর্নি সার্ভিসের উদাহরণ প্রতিবেশি দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের মধ্যে মতবিনিময় এবং ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিবিধ

জরুরী অবস্থার বিধানাবলী

১. কমিশন সুপারিশ করছে যে, কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

২. জরুরী অবস্থার সময়কাল ৬০ দিনের বেশি হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি আরও সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারবে।

৩. জরুরী অবস্থার সময় সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা নাগরিকদের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না। তবে, সাধারণভাবে সংবিধান দ্বারা আরোপিত নাগরিকদের অধিকারের উপর কোনো বিধিনিষেধ বা সীমাবদ্ধতা জরুরি অবস্থার সময় সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১খ বাতিলের সুপারিশ করছে ।

৪. কোনো অবস্থাতেই, নাগরিকদের তাদের অধিকার প্রয়োগের জন্য আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। ফলশ্রুতিতে, জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকের অধিকারের কোনো প্রকার লঙ্ঘন বা অপব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে। অতএব, কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১গ বাতিলের সুপারিশ করছে।

নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি:

১. 'নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি'র বর্তমান সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে, যাতে বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় সব ধরনের সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)(খ) সংকীর্ণ। এটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা যেতে পারে: ''অভ্যন্তরীণ জলভাগ, রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা, সন্নিহিত অঞ্চল, মহীসোপান ও সম্প্রসারিত মহীসোপান, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ), এবং গভীর সমুদ্রে প্রযোজ্য অধিকারসহ সামুদ্রিক অঞ্চলের সকল ভূমি, খনিজ সম্পদ, মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য যে কোনো জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক সম্পদ যা বাংলাদেশ আইন অনুসারে প্রাপ্য হবে।''

২. অনুচ্ছেদ ১৪৩(২) – এ সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শুধুমাত্র 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান' বিষয়ে সীমাবদ্ধ । কমিশন সুপারিশ করছে যে, অনুচ্ছেদ ১৪৩(২) এর বিধানটি নিম্নরূপ হতে পারে: 'সংসদ সময়ে সময়ে আইন দ্বারা বাংলাদেশের ভূখন্ডের এবং জলভাগের সীমা- নির্ধারণের বিধান করতে পারে।'

চুক্তি:

১. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ক এর মাধ্যমে কেবলমাত্র বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংসদে উপস্থাপনের বিধান করা হয়েছে। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করার বিধান আছে। ফলে জাতীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে এমন অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি, চুক্তিপত্র এবং দলিলসমূহ গোপনীয়তার আড়ালে সম্পাদন সম্ভব। কমিশন সুপারিশ করছে যে, সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিল যা কোনো দেশ/সংস্থা/কর্পোরেশনের সাথে সম্পাদিত হয়, তা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়াও, কমিশন সুপারিশ করেছে যে, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়বস্তু নিয়ে চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিলের ক্ষেত্রে সংসদের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন।

২. কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৫ক নিম্নলিখিতভাবে সুপারিশ করছে: 'বিদেশি রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি, এবং বিদেশি সংস্থা ও বিদেশি বা বিদেশি মালিকানাধীন কর্পোরেশনের সাথে সকল চুক্তি ও চুক্তিপত্র নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে এবং নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক সংসদে উপস্থাপিত হবে। তবে, প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব, সীমানা, জাতীয় নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক সম্পদ, জ্বালানি এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত যে কোনো চুক্তি, চুক্তিপত্র বা দলিল সংসদের উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদনের পরেই সম্পাদন করা যাবে।'

সংজ্ঞা:

১. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ তে 'রাষ্ট্র' এর বর্তমান সংজ্ঞায় 'সংসদ, সরকার এবং আইনানুগ সরকারি কর্তৃপক্ষ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি হলেও এটি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২. কমিশন 'রাষ্ট্র' শব্দের সংজ্ঞা সংশোধন করে **'বিচার বিভাগ'কে** অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। 'সংসদ, সরকার এবং আইনানুগ সরকারি কর্তৃপক্ষ' এর পরিবর্তে বিচার বিভাগ ছাড়াও, **'আইন বিভাগ'** এবং **'নির্বাহী বিভাগ'**কে রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে। সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'রাষ্ট্র' শব্দের সংজ্ঞা নিম্নরূপ সংশোধন করা হোক: '"রাষ্ট্র' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইনসভা, **নির্বাহী বিভাগ** এবং বিচার বিভাগ।"

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি:

কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্তির সুপারিশ করছে, এবং এর সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখার সুপারিশ করছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সুপারিশের যৌক্তিকতা

প্রস্তাবনা

১. জনগণের ধারাবাহিক সংগ্রামের যথাযথ স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তার ভূমিকাকে মর্যাদা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের স্বীকৃতি না দিলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা এবং দলীয়করণের ঝুঁকি তৈরি হয়, যা স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যক্ষ করা গেছে। একটি জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগ ও নিবেদনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার শীর্ষবিন্দু হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। পাশাপাশি, ২০২৪ সাল যেভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় গতিপথে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে, তার স্বীকৃতিও সংবিধানে থাকা উচিত বলে কমিশন মনে করে।

২. স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন মূলনীতি—সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার—এবং ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনা রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলে তা বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাবে। একই সঙ্গে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদকে গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। কমিশনের মতে, বহুত্ববাদ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস, ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে সকলকে সমমর্যাদায় অভিষিক্ত করে এবং স্বাধীন সত্তায় যৌথ বিকাশ নিশ্চিত করে। বহুত্ববাদকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশে বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সকল জনগোষ্ঠীর পরিচয়, মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩. "প্রজাতন্ত্র" শব্দটি নিয়ে কমিশনের কাছে জনসমাজের অনেক সদস্য আপত্তি জানিয়েছেন। তাদের মতে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক চরিত্র এবং শাসকদের সামন্তবাদী জমিদারসুলভ আচরণ "প্রজাতন্ত্র" ধারণার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। কমিশন মনে করে, দেশের অধিবাসীদের "নাগরিক" হিসেবে দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি প্রদান এবং শব্দগত বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের নাম "জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ" করা হলে তা দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। এটি দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নাগরিকদের মর্যাদাকে আরও সুসংহত করবে।

নাগরিকতন্ত্র (বর্তমানে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত)

রাষ্ট্র:

কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে ব্যবহৃত 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো সংশোধন করা হবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক চরিত্র ও শাসকদের জমিদারসুলভ আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে "প্রজাতন্ত্র" শব্দটির মাঝে। কমিশন, "নাগরিক" হিসেবে দেশের অধিবাসীদের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি এবং শব্দগত বিভ্রান্তি এড়াতে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহার করার সুপারিশ করছে।

ভাষা:

নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। তবে, কমিশন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করার সুপারিশ করছে। বহুভাষিক স্বীকৃতি একটি জাতির বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রসারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষিক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব এবং জাতীয় পরিচয়ে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রান্তিকীকরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। উপরন্তু বহুভাষিক স্বীকৃতি সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি তৈরি করতে সাহায্য করে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। সে জন্য সংবিধানে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: 'নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা 'বাংলা'। সংবিধান বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

নেপালের সংবিধানে একটি অনুরূপ বিধান রয়েছে, যা নেপালে মাতৃভাষায় কথিত সকল ভাষা সে দেশের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১] দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানও **১১**টি সরকারি ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়, যার মধ্যে জুলু, খোসা, আফ্রিকান্স এবং ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[২]

প্রতিকৃতি প্রদর্শন:

কমিশন সুপারিশ করছে যে, জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক বিধান (বিদ্যমান সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত করা হোক। এরূপ বিধান ব্যক্তি বন্দনাকে উৎসাহিত করে, স্বৈরতন্ত্রের পথ সুগম করে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা সাধারণত তাদের ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য এবং বিরোধিতা দমন করার জন্য এমন বিধান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে জোসেফ স্তালিন, চীনে মাও সে-তুং এবং উত্তর কোরিয়ায় কিম জং-উন।

এছাড়া কোনো একক ব্যক্তিকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করা সমীচীন নয়। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন এবং সর্বোচ্চ ত্যাগও স্বীকার করেছেন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগ উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। ফলে, এই রক্তস্নাত মাতৃভূমিতে কোনো একক ব্যক্তিকে 'জাতির পিতা' হিসেবে অভিহিত করার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা বাস্তবতা নেই। শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব এককভাবে তুলে ধরলে স্বাধীনতাযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা অনেক ব্যক্তির অবদান ম্লান হয়ে যায়, যা একেবারেই ন্যায়সঙ্গত নয়।

নাগরিকত্ব:

'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি ...' কমিশন এই বিধান বিলুপ্ত করার সুপারিশ করছে। কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৬(২)** পরিবর্তিত হয়ে নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হোক: 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন।'[৩] বর্তমান **অনুচ্ছেদ ৬(২)** বাংলাদেশের জনগণকে একটি নির্দিষ্ট জাতিগত পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করে। এর ফলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী অবহেলিত এবং উপেক্ষিত বোধ করতে পারে। এরূপ প্রান্তিকীকরণের ফলে নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা ও সমান অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।

সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ:

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। অনুচ্ছেদ ৭ক সংবিধান সমালোচনার অধিকারকে সীমিত করে এবং স্বাধীন মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে। এই বিধান অনুসারে সংবিধানের সমালোচনা করাও সংবিধানের প্রতি

[১] নেপালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬

[২] দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(১)

[৩] এ ধরনের বিধান ১৯৭৯ সালের সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন দ্বারা আনীত সংশোধনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নাগরিকদের 'আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয়' পরাহত হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এমন একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা রাজনৈতিক অপব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। তদুপরি পর্যাপ্ত স্পষ্টতার অভাবে অনুচ্ছেদ ৭ক এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

বিভিন্ন সাংবিধানিক বিধানের সংশোধন অযোগ্যতা:

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্তির সুপারিশ করছে। এই অনুচ্ছেদ সংবিধানের এক–তৃতীয়াংশের বেশি বিধানকে চিরকালের জন্য 'সংশোধন-অযোগ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমন বিধান আইনগতভাবে অযৌক্তিক; কারণ, এটি ভবিষ্যতের সংসদকে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে বাধা প্রদান করে। 'সাংবিধানিক হাতকড়া' হিসেবে বর্ণিত এরূপ চিরস্থায়ী বিধান নাগরিকদের সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরন্তু এই বিধান সংবিধানের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের মূলনীতি সংক্রান্ত বিধানের অন্তর্ভুক্তি:

কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের আদর্শ বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ২০২৪ সালে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতার আদর্শ সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করেছিল। অধিকন্তু, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বহুত্ববাদ অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, বাংলাদেশের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে ধারণ করে এমন একটি বিধান সংবিধানে যুক্ত করা সমীচীন। সে জন্য কমিশন নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে: 'বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।'

রাষ্ট্রের মূলনীতি:

কমিশন রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করেছে।

জাতীয়তাবাদ:

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ মূলত বাঙালি জাতিগত পরিচয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সংবিধান (অনুচ্ছেদ ৯) জাতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে, যা বাঙালি ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ অন্য গোষ্ঠীর স্বার্থ বা মূল্যবোধ উপেক্ষা করে। এর ফলে প্রান্তিকীকরণ ঘটে, যা সামাজিক বিভাজন, বৈষম্য এবং সংঘর্ষের জন্ম দেয়।

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যখন একটি রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ে গড়ে ওঠে, তখন যারা এই পরিচয়ের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, তারা বৈষম্য ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার শিকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসি পার্টি চরম জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল, যেখানে আরিয়ান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং জার্মান জাতীয়তাবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই চরমপন্থার ফলে একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যেখানে ভিন্নমত দমন করা হয় এবং ইহুদি, রোমানি জাতি ও অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়।

কমিশন মনে করে যে, জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ মূলত গণতন্ত্রবিরোধী। সুতরাং রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে **জাতীয়তাবাদ** বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

সমাজতন্ত্র:

সমাজতন্ত্র মূলত গণতান্ত্রিক শাসনবিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত অধিকার এবং স্বাধীনতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে, যা সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রধানত শিল্প ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, যা ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ স্বায়ত্তশাসন নীতির বিরোধীও বটে।

এছাড়া সমাজতন্ত্র সাধারণভাবে সামষ্টিগত মালিকানা এবং সম্পদ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দেয়, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। কিউবা এবং প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল, যা রাজনৈতিক বহুত্ববাদ এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সীমিত করেছিল।

তাছাড়া গত কয়েক দশকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি ক্রমশই সমর্থন কমেছে। অনেকেই এখন সমষ্টিগত মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেন। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র বাদ দেয়া হোক।

ধর্মনিরপেক্ষতা

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এটি ১৯৭০ সালের **লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার** বা আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহার বা ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত পাকিস্তানের খসড়া সংবিধানে উল্লিখিত ছিল না। কোনো প্রাক্-সাংবিধানিক নথিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শাসননীতি হিসেবে গ্রহণ করার কোনো উল্লেখ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব রাজনৈতিক আলোচনায় ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল একপ্রকার অপরিচিত ধারণা।[৪] তবু কোনো অর্থবহ আলোচনা ছাড়াই ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫]

এছাড়াও, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, এবং অতীতে ফ্যাসিবাদী শাসনের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এটি বাংলাদেশের বিদ্যমান বহুত্ববাদী সমাজের ধারনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং মূলত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিরোধী। সুতরাং রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে **ধর্মনিরপেক্ষতা** বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

[৪] আসিফ নজরুল, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২: গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, প্রথমা প্রকাশন (২০২২), পৃষ্ঠা ১৪৫

[৫] আসিফ নজরুল, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২: গণপরিষদের রাষ্ট্রভাবনা, প্রথমা প্রকাশন (২০২২), পৃষ্ঠা ১৩৮

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা

১। বাংলাদেশের সংবিধানে সীমিতসংখ্যক মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমান মৌলিক অধিকার ভাগে কেবল কয়েকটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে, যা সংক্ষিপ্তভাবে নীতিভিত্তিক ভাষায় বর্ণিত। যদিও দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত অধিকারের উল্লেখ রয়েছে , সেগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয় এবং মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় না। সংবিধান রাষ্ট্রকে এই নীতিগুলো অনুসরণ করে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিলেও, এই নীতিগুলো বাস্তবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, আদালত তা পর্যালোচনার ক্ষমতা রাখেন না। নীতিগুলোকে এভাবে উপেক্ষা করার ফলে সেগুলো কার্যত অর্থহীন অনুচ্ছেদে পরিণত হয়, যা সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদার ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম আদর্শ হলো, মানবাধিকারসমূহ বিভাজনযোগ্য নয় এবং তাদের মধ্যে কোনো উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করা যায় না। প্রথম, দ্বিতীয় এবং কিছু তৃতীয় প্রজন্মের অধিকারকে পৃথক করে সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কেবল তৃতীয় ভাগকে বলবৎযোগ্য করা এই নীতির পরিপন্থী।

তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অধিকার এবং তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো সংশোধন করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক অধিকারের সনদ গঠন করা হোক।

২। বর্তমান সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগে গণতন্ত্র, ক্ষমতার পৃথকীকরণেরমতন কিছু আকাঙ্ক্ষামূলক নীতি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আশ্রয়ের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে এগুলো আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। দ্বিতীয় ভাগ থেকে এই অধিকারগুলোকে নতুন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামক একক অধিকারের সনদে অন্তর্ভুক্ত করার পরেও আকাঙ্ক্ষামূলক নীতিগুলো রয়ে যাবে। এই নীতিমালাগুলো সংশোধিত প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা প্রথম ভাগের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হবে। তবে, এ সকল নীতি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সংবিধানে এদের আগের মতন অকার্যকর করে রাখার কোনো অবকাশ নেই; কারণ এর অন্যথা হলে রাষ্ট্র জবাবদিহির ঊর্ধ্বে চলে যাবে। উপরন্তু, সংবিধান যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, এতে এমন কোনো বিধান থাকা উচিত নয়, যা বলবৎযোগ্য নয়। একারণে, এই নীতিগুলো এমনভাবে নতুন করে প্রণয়ন করা উচিত, যেন ভবিষ্যতে সেগুলো ধাপে ধাপে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে। নীতিগুলোকে কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে, এমন একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেখানে তাদের ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন আদালতের পর্যালোচনার আওতায় আনা যায়। এই ব্যবস্থাটি সাংবিধানিক আইনের প্রগতিশীল বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার উদাহরণ দক্ষিণ আফ্রিকাসহ নানা দেশে দেখা যায়।

তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাগুলো সংবিধানের প্রথম ভাগে স্থানান্তরিত হোক।

৩। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' এবং 'আইনের সমান সুরক্ষা'–সংক্রান্ত সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের 'সম্মান' ও 'সুরক্ষা'-র দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এর 'বাস্তবায়ন'-এর দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। তাই, 'আইনের সমান সুরক্ষা' শব্দগুচ্ছের পরিধি বাড়িয়ে 'আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা' অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যাতে সমতার অধিকারের 'বাস্তবায়ন'-এর দিকটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। এ ক্ষেত্রে নাগরিকদের পাশাপাশি সকল ব্যক্তির জন্য এই সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে যাতে বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সকলের জন্য একটি ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'আইনের সমান সুরক্ষার' পরিধি সম্প্রসারণ করে 'আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা' (নাগরিকদের পরিবর্তে সকল ব্যক্তির জন্য) অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৪। ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে বৈষম্যের অননুমোদিত কারণগুলোর যে তালিকা আছে (ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থান), তা সীমিত এবং সেখানে অল্প কয়েকটি বৈষম্যের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণগুলো পরিবর্তিত সমাজের জটিল বৈষম্যগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না, ফলে, অনেক প্রকার সূক্ষ্ম ও কাঠামোগত বৈষম্য সাংবিধানিক সুরক্ষার বাইরে থেকে যায়।

তাই, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে অননুমোদিত বৈষম্যের যে সীমিত তালিকা আছে, তা পরিবর্তন করে এমন একটি তালিকা করা হোক যেখানে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গায়ের রং, নৃগোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, জন্মস্থান-এই সবসহ আরও অনেক কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫। ৩২ অনুচ্ছেদে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার একসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, অথচ স্বাধীনতার বিষয়টি ৩৩ অনুচ্ছেদের গ্রেপ্তার ও আটকের বিধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের অধিকারের সর্বোচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে ৩২ অনুচ্ছেদটিকে কেবল

জীবনের অধিকারের সুরক্ষার বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। এই অধিকারের সুরক্ষাকে আরও জোরদার করতে সংবিধানে এমন সুস্পষ্ট বিধান থাকা প্রয়োজন, যাতে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারীভাবে কারও জীবন কেড়ে নিতে না পারে। পাশাপাশি, এই অনুচ্ছেদটিতে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন থাকা উচিত।

তাই, জীবনের অধিকারের সর্বোচ্চ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার রক্ষা নিয়ে একটি আলাদা অনুচ্ছেদ থাকবে, যা রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় (non-state) সংস্থাসমূহ কর্তৃক বেআইনি কাজ, যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সংবিধানে শারীরিক অখণ্ডতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ষার বিধান সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করা হোক।

৬। সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড থেকে সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুচ্ছেদটির শিরোনাম 'বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে সুরক্ষা' হওয়ায়, এই সুরক্ষা শুধু বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড'-এর সুরক্ষার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং তা বিচার ও শাস্তির বাইরে অন্যান্য পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'যন্ত্রণা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড' সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা বিচার ও দণ্ড এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৭। অনুচ্ছেদ ৩৪ শুধু বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে, এই অনুচ্ছেদের ভাষা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি—বিশেষত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR), এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর কনভেনশনগুলোর ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, দাসত্ব, বশ্যতায় আবদ্ধ রাখা এবং জবরদস্তি শ্রম বিষয়ক বর্তমান অনুচ্ছেদটি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক একটি নতুন অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হোক।

৮। মানব পাচার এবং আধুনিক শোষণের বিভিন্ন রূপ—যার মধ্যে মানব পাচার, যৌন পাচার, শোষণ, দাসত্ব এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রম অন্তর্ভুক্ত—বাংলাদেশে মানব নিরাপত্তার অন্যতম বড় হুমকি, তবে বর্তমান সংবিধানে এই হুমকিগুলো মোকাবিলায় সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মানব পাচার, যৌন পাচার এবং শোষণের সকল রূপ, যার মধ্যে চোরাচালান, শোষণ এবং দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত, প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক।

৯। বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত সুরক্ষার বিদ্যমান ৩৫ অনুচ্ছেদে সীমিত পরিমাণে বিষয়গত এবং প্রক্রিয়াগত অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে, আইনের ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা থেকে সুরক্ষা (অতীতের কোনো কাজের জন্য বর্তমানে আইন করে শাস্তি না পাওয়ার অধিকার), একই অপরাধের জন্য দুবার বিচারের হাত থেকে সুরক্ষা, দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকার এবং নিজের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষ্য না দেওয়ার অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। তবে, আধুনিক সংবিধানে যে ধরনের ব্যাপক সুরক্ষা থাকা উচিত, তার তুলনায় এই সুরক্ষা যথেষ্ট নয়।

তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিচার ও দণ্ডসংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে অবিলম্বে অবহিত হওয়ার অধিকার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, সময়মতো বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার, এবং অসাংবিধানিক বা বেআইনি উপায়ে প্রাপ্ত প্রমাণ বাতিল করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১০। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং একটি মৌলিক মানবাধিকার। সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে বাক ও চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল যুগে, যেখানে তথ্যপ্রবাহ ও গণমাধ্যম সমাজের চালিকাশক্তি, সেখানে এই অধিকারের আরও সুস্পষ্ট ও জোরালো সুরক্ষা প্রয়োজন। বিশেষ করে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে হুমকির মুখে ফেলার নজির আছে। নানান রাষ্ট্রে এই প্রবণতা দেখা যাওয়ায়, আধুনিক সংবিধানে গণমাধ্যমের ওপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রোধের ব্যবস্থাসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্র এই নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে না, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের মালিকানা গোষ্ঠীতান্ত্রিক বা একচেটিয়া হতে দেবে না।

১১। ইন্টারনেট বর্তমানে মানুষের জীবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, অনেক মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করার জন্য এটি অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি, বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনীতিও ইন্টারনেটের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, কারণ বহু পণ্য ও সেবার সরবরাহ ব্যবস্থা এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই নির্বিচারে ইন্টারনেট ব্যবহার বন্ধ করে দিলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। এর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, এস্তোনিয়া, গ্রিস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আধুনিক সংবিধানে ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড এবং কোস্টারিকার সাংবিধানিক আদালতসমূহও এই অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হোক, যা ইন্টারনেট প্রাপ্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করবে এবং সকল নাগরিকের জন্য যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

১২। তথ্য পাওয়ার অধিকার জনগণ ও সরকারের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি দেশের শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু এই অধিকার সংবিধানে সুরক্ষিত নয়। সংবিধানে এই অধিকার অন্তর্ভুক্ত করলে এটি আরও গুরুত্ব পাবে এবং জনগণের ক্ষমতা বাড়াবে। নেপাল, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, তিউনিসিয়া এবং ভুটানসহ ৩৩টি দেশ ইতোমধ্যে তাদের সংবিধানে এই অধিকার সংযোজন করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকার অন্তর্ভুক্ত করলে সমাজের সকল স্তরের নাগরিক, প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন এবং সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, তথ্য পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

১৩। সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ, যা জনগণকে তাদের মতপ্রকাশ এবং যৌথ লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে এই অধিকার স্বীকৃত হলেও, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ওপর বিধিনিষেধ এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মতো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এতে নাগরিকদের সর্বাত্মকভাবে জনজীবনে অংশগ্রহণের সক্ষমতা সীমিত হয়। এ ছাড়া, যুক্তিসংগত বাধানিষেধ শব্দবন্ধটির অর্থ অস্পষ্ট, তাই সরকার চাইলে এর অপব্যবহার করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক দেশ তাদের সংবিধানে এই অধিকারগুলো স্পষ্টভাবে রক্ষা করে, যাতে নাগরিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে, ইউনিয়ন গঠন করতে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই নিজেদের দাবি জানাতে পারে। এ ছাড়া, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা; শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করার অধিকার গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায়, এই দুটি অধিকারকে একটি অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বুরুন্ডি, জিম্বাবুয়ে, বলিভিয়া এবং সেনেগালের মতো কয়েকটি দেশের নতুন সংবিধানে দেখা যায় যে, অধিকার দুটিকে একটিমাত্র অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করার একটি নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

তাই কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হোক, যাতে জনগণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান করতে পারে এবং কাউকে কোনো দল বা গোষ্ঠীতে যোগদান করতে বা থাকতে বাধ্য না করা হয়।

১৪। চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা ব্যক্তিদের তাদের বিশ্বাস মুক্তভাবে এবং বৈষম্য বা জবরদস্তির ভয় ছাড়াই চর্চার সুযোগ দেয়। সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা একটি পরম অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার কিছু সুরক্ষা থাকলেও, তা আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার অধীন, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নেই। সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করলেও, এটি অবাধে ধর্মচর্চার অধিকার স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করে না এবং নাগরিকদের মতো অ-নাগরিকদের ক্ষেত্রেও একই রকম সুরক্ষা দেয় না। সুদান, কিউবা, ফিজি, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক দেশে অ-নাগরিকসহ সবাই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। এতে সকল ব্যক্তি সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন, শিক্ষা এবং চর্চায় সম্পৃক্ত হতে পারে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে একটি বিস্তারিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রকাশ্যে বা ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে ধর্ম পালন, প্রচার, প্রসার এবং প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

১৫। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনো নাগরিককের বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে একটি সম্ভাব্য যুক্তি হলো, এটি নাগরিকদের মধ্যে পরোক্ষভাবে সমতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। কারণ বিদেশি উপাধি, সম্মান বা পুরস্কার পেলে তাদের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি

হতে পারে। তবে, এই ধারণাটি সমসাময়িক নয় , কারণ ঔপনিবেশিক আমলের মতন, বিদেশি উপাধি বা সম্মানের মাধ্যমে বর্তমানে বৈষম্য সৃষ্টি হয়না। তাছাড়া, এই অনুচ্ছেদটি নাগরিকের অধিকারের পরিবর্তে তাদের উপর একটি বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যা বাকি অনুচ্ছেদগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিদেশি খেতাব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা হোক।

১৬। বর্তমান সংবিধানে ভোট দেওয়ার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এই অধিকার যেভাবে বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে, তেমন আর কোনো অধিকারের ক্ষেত্রে ঘটেনি বললেই চলে। তাই, এখন সময় এসেছে ভোটাধিকারকে সংবিধানে একটি সুস্পষ্ট অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার। এছাড়া, জনগণের অংশগ্রহণ একটি কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য খুবই জরুরি, কারণ এর মাধ্যমে সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে এবং নাগরিকরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, নাগরিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত প্রদান করে, যা শাসনের বৈধতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হোক।

১৭। বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হলেও, অন্যান্য দেশের সংবিধানে এই অধিকারের প্রয়োগ এবং সীমানা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যমান সংবিধানে ব্যক্তিগত, সমবায়ী এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত, যেখানে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত মালিকানা স্বীকৃত নয়। অথচ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত মালিকানা বিশেষ গুরুত্ব বহন করতে পারে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং সমবায়ী-এই বিভিন্ন প্রকার মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

১৮। গোপনীয়তার অধিকার বর্তমানে খুব জরুরি হলেও, বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকারের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা, নাগরিকের স্বাধীনতা, এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য ব্যক্তি ও জনপরিসরে গোপনীয়তার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরি। এই স্বীকৃতি ডিজিটাল যুগে তথ্যের অপব্যবহার রোধ এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, বলিভিয়া ও ফিজির মতো আধুনিক সংবিধানগুলোতে স্পষ্টভাবে গোপনীয়তার অধিকার স্বীকৃত, এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ব্যক্তি ও জনপরিসর উভয় ক্ষেত্রে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার থাকবে।

১৯। বিদ্যমান সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষার অধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আইনের দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে। অন্যান্য রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মতো এটিও আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। তবে, বিশ্বব্যাপী বহু সংবিধানে শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতও প্রথমে এই অধিকারকে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, কিন্তু এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০২ সালে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে এটিকে মৌলিক অধিকারে উন্নীত করেছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিক্ষার অধিকারকে বলবৎযোগ্য সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হোক। রাষ্ট্রকে অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষা সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

২০। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের নাজুক অবস্থা ও রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্থান দেওয়া অত্যাবশ্যক। বিশ্বের অনেক সংবিধানে, যেমন—দক্ষিণ আফ্রিকা, তিউনিসিয়া ও ফিজিতে, এই বলবৎযোগ্য অধিকার স্বীকৃত, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য জরুরি স্বাস্থ্যসেবার অধিকার অত্যন্ত জরুরি, যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতও ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের আওতায় একটি বলবৎযোগ্য স্বাস্থ্য অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। রাষ্ট্রকে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল নাগরিকের জন্য জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

২১। স্বাস্থ্যকর ও অর্থবহ জীবনের জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও, খাদ্য, পানি ও পয়োনিষ্কাশনের অধিকার বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে নেই। সম্পদের সীমাবদ্ধতা এই অধিকারসমূহকে অবলবৎযোগ্য রাখার যৌক্তিক কারণ হতে পারে না। অন্যদিকে, এই অধিকারগুলোর কয়েকটি দিক, যেমন সুষম বণ্টন বাস্তবায়নের জন্য খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না; বরং বর্তমানে যে সম্পদ আছে, তার সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, যথাযথ, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার ও পানযোগ্য পানি এবং পয়োনিষ্কাশনের অধিকার রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

২২। বাংলাদেশে গৃহহীনতা একটি গুরুতর সমস্যা, এবং যারা নিজের চেষ্টায় আবাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, তারাও আবাসন সংক্রান্ত বিধিবিধানের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মতন অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হন। তাই, বিশ্বের অনেক সংবিধানে যেমন দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানেও বাসস্থানের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং, কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় বাসস্থানের অধিকার বলবৎযোগ্য করা হোক, যাতে যথাযথ, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

২৩। বাংলাদেশে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকার প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। খাদ্যে ভেজাল, এবং ভবন নির্মাণ, রান্না ও সেবার নিয়ম না মানার কারণে জনস্বাস্থ্য প্রায়ই বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ে। ভোক্তাদের অধিকার রক্ষার জন্য বর্তমানে যে আইনগুলো প্রচলিত আছে, সেগুলো ভোক্তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি, এমনকি তাদের জন্য কোনো ইতিবাচক অধিকারও তৈরি করতে পারেনি। বাংলাদেশে ক্রেতারা পণ্যের মান নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভোগে। এছাড়া, নিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত মূল্যবৃদ্ধি এবং বাজারের অস্থিতিশীলতা ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশার মূল কারণ।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

২৪। বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা বলবৎযোগ্য নয়। দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সংকট আর সামাজিক বঞ্চনা থেকে দুর্বল মানুষদের বাঁচাতে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি। শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা একটি স্থিতিশীল সমাজ ও টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

২৫। বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদে ২০-এ কর্মের অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। বিদ্যমান অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং ন্যূনতম মজুরির মতো জরুরি বিষয়গুলোর অভাব আছে। বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোতে কয়েকটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে, আর চা উৎপাদনসহ অনেক খাতেই কম মজুরি নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে। অথচ, অনেক আধুনিক সংবিধানে কর্মের অধিকারের জোরালো সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের মাধ্যমে সম্মানজনক ও সুরক্ষিত কাজের অধিকারকে বলবৎযোগ্য করা হোক।

২৬। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষের বসবাস, তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। কিন্তু নিজেদের সংস্কৃতি ধরে রাখা ও উন্নতির কোনো বলবৎযোগ্য অধিকার সংবিধানে নেই। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য একটি দেশের সম্পদ, এবং এর সুরক্ষা জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, মানুষের নিজের সংস্কৃতি উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অধিকার আছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।

২৭। বাংলাদেশে জাতীয়, জাতিগত, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও স্বীকৃতি একটি চলমান উদ্বেগের বিষয়, তবে সংবিধানে এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য নির্দিষ্ট বলবৎযোগ্য অধিকার প্রদান করা হয়নি। সংখ্যালঘুদের প্রতি সত্যিকারের সম্মান ও

সুরক্ষা দেখাতে হলে, সংবিধানে তাদের জন্য বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন কেনিয়া, আর্মেনিয়া ও মন্টেনিগ্রো এই পথে হেঁটেছে।

অতএব, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।

২৮। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন, যারা নানা কারণে পিছিয়ে আছেন। যদিও প্রচলিত সাধারণ আইন দ্বারা প্রতিবন্ধীদের কিছু অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে, বর্তমান সংবিধানে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই। সংবিধানে অধিকার যোগ করা সব সময়ই ফলপ্রসূ, কারণ এতে সাধারণ আইনের জোর বাড়ে এবং সরকার কর্তৃক অধিকারের অপব্যবহার রোধ হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)-এর পক্ষভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ওই কনভেনশনের মৌলিক বিধানসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত। তদুপরি, সুদান, কিউবা, নেপাল, ডোমিনিকান রিপাবলিকসহ অনেক নতুন সংবিধানেও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাই দেশের প্রয়োজন ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে এই ব্যবস্থা সংবিধানে যোগ করা জরুরি।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বিশেষভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এমন অধিকার যোগ করা হোক যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে- বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ, ইশারা ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ এবং তাদের প্রতিবন্ধকতার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যুক্তিসংগত প্রাপ্তির সুযোগ।

২৯। শিশুদের জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; তাই তাদের সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা ভবিষ্যতে জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান সংবিধানে শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান নেই; কেবল ২৮(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ সুবিধার প্রসঙ্গেই তাদের উল্লেখ রয়েছে। তবে, বর্তমানে, বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধানেই শিশুদের অধিকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রচলন বাড়ছে। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (UNCRC)-এর স্বাক্ষরকারী এবং এই সনদের আলোকে শিশুদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে, তবুও এই অধিকারগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা অধিক গুরুত্ব বহন করবে। তখন কোনো শিশুর অধিকার ক্ষুণ্ন হলে, সে সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে গিয়ে বিচার চাইতে পারবে। পাশাপাশি, শিশুদের জন্য একটি পৃথক বিধান তাদের অধিকারকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেবে এবং সংবিধানকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে-নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে টিকা, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।

৩০। বর্তমান সংবিধানে পরিবেশের অধিকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে, মৌলিক অধিকার হিসেবে নয়। ফলে এটি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এবং বাংলাদেশের সংবিধানে জীবনের অধিকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অনেক বিচারিক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।

৩১। উন্নয়নের অধিকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পটভূমি তৈরি করবে। এছাড়া ১৯৮৬ সালের জাতিসংঘ ঘোষণায় (Declaration on the Right to Development) উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই অধিকার সংবিধানে যোগ করলে বোঝা যাবে দেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়মকানুন আর দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

৩২। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights)-তে বিজ্ঞানের অধিকার সম্পর্কে বিধান রয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বহু সংবিধানে এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তদুপরি, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৯ (উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা) বাস্তবায়নের জন্য গবেষণার স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সুফল ভোগ করতে বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করা অপরিহার্য। বিজ্ঞানের সুবিধার অপব্যবহারের একটি সম্ভাবনা থাকে, তাই রাষ্ট্রকে বিজ্ঞানের প্রতিকূল প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩৩। যদিও বাংলাদেশের সংবিধান অনুচ্ছেদ ১৮(ক)–এর অধীনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ওপর আইনত বলবৎ-অযোগ্য একটি দায়িত্ব অর্পণ করে, সংবিধান এটিকে 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এছাড়া এতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আর্থিক দায় এবং সুবিধার ন্যায্য ভাগ অথবা সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারের বিধানের অভাব আছে। কেনিয়া, ভুটান, পোল্যান্ড, ইউক্রেন, আর্জেন্টিনা, এবং হাঙ্গেরির মতো বেশ কয়েকটি দেশ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মের উপকারের জন্য দায়িত্বশীলভাবে সম্পদ পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য টেকসই আর্থিক পদ্ধতি, টেকসই পরিবেশ এবং উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

৩৪। জীবনের অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞার মতো কিছু অধিকার আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে কিছু নিয়ম jus cogens (আন্তর্জাতিক আইনের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম) নীতির মর্যাদা অর্জন করেছে, যা থেকে কোনো বিচ্যুতি অনুমোদিত নয়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তি শ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।

৩৫। ১৯৭৩ সালের সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইনের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে দুটি অতিরিক্ত বিধান যোগ করে নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিধানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা ছাড়াই এবং উপদেষ্টা পর্ষদের পর্যালোচনার মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। গত ৫২ বছরে নিবর্তনমূলক আটক রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের বা আদালতের শুনানি ছাড়াই আটক ব্যক্তিকে কারাগারে রাখা হয়, যা নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। নাগরিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যে অনুচ্ছেদ, একই অনুচ্ছেদে নিবর্তনমূলক আটক বৈধ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানের নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধানটি বিলুপ্ত করা হোক।

৩৬। বাংলাদেশে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আদালতের দেওয়া রায় সাধারণত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়, তবুও যদি কেউ যুক্তিসঙ্গত এবং উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সেই রায়ের সমালোচনা করে, তাহলে সেই সমালোচনা আইনি ব্যাখ্যা এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই কারণে, আদালতের রায়ও জনসমালোচনার বাইরে নয়, অর্থাৎ জনগণের আলোচনার বিষয় হতে পারে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টভাবে আদালতের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৩৭। সংবিধানে মানবাধিকারের জবাবদিহির বিষয়টি প্রায় পুরোটাই বিচার বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। সুপ্রিম কোর্টের সংসদ বা নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইন, সেই সঙ্গে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক গৃহীত যেকোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপের সাংবিধানিকতা

পর্যালোচনার ক্ষমতা রয়েছে। তবে, মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত আইনসমূহ পর্যালোচনার জন্য সংসদে কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নেই। কিছু গণতান্ত্রিক দেশে, সংসদীয় কমিটি বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রাথমিক পর্যালোচনা করা হয়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।

৩৮। সংবিধানে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যাবে, তা নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। যদিও আদালতের বিভিন্ন রায়ে মাঝে মাঝে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও এই অস্পষ্টতার কারণে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা বা ক্ষতিপূরণের মতো বিশেষ প্রতিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই কড়াকড়ি দেখা যায়।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে একক ও যৌথভাবে আদালতে দায়বদ্ধ করা হোক। এবং এক্ষেত্রে আদালত আইন দ্বারা নির্ধারিত উপযুক্ত প্রতিকার ও শাস্তি প্রদান করবে।

৩৯। কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নেবর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে:

(ক) আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না;

(খ) আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না;

(গ) আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না;

(ঘ) এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং

(ঙ) এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

৪০। সংবিধানে কিছু অধিকার (বিশেষ করে কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার) এমন হতে পারে যা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রকট। সেক্ষেত্রে, অধিকারগুলোকে সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করে এবং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বাস্তবতার নিরিখে অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয়া উচিত। অধিকারের ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের দুটি সম্ভাব্য পদ্ধতি রয়েছে: হয় এটিকে রাষ্ট্রের বিবেচনার উপর পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া, অথবা এটিকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধীন করা। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে, যা সরকারকে মূলত জবাবদিহিতাবিহীন করে তোলে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং এই অধিকারগুলি সমুন্নত রাখতে, বাংলাদেশের উচিত অধিকারগুলোর ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রবর্তন করা। এতে রাষ্ট্র তার বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে অধিকারগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করতে যৌক্তিকভাবে কাজ করেছে কিনা আদালত তা যাচাই করে দেখবে। তবে, এভাবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরিধি বৃদ্ধি করলে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের অতি-সক্রিয়তা (judicial overreach) দেখা দিতে পারে। আদালত যাতে তাদের পর্যালোচনার ক্ষমতা দায়িত্বশীলতার সাথে এবং আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের কার্যাবলীতে অযথা হস্তক্ষেপ না করে প্রয়োগ করে, সেজন্য সংবিধানে স্পষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। এভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া অধিকারগুলোর ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে।

অতএব, কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে, এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে:

(ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই;

(খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান-বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

(গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।

আইনসভা

বাংলাদেশে একটি এককক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে, যা জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত। এটি একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত অতিরিক্ত ৫০ জন নারী সদস্য নিয়ে গঠিত।[১] রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, মুলতবি এবং ভেঙে দিতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই সংসদ আহ্বান করতে হয়। রাষ্ট্রপতি যদি সংসদ আগেই ভেঙে না দেন, তবে সংসদ তার প্রথম বৈঠকের পাঁচ বছর পর নিজে নিজেই ভেঙে যায়।[২] সংসদের অবস্থান রাজধানীতে। সংসদ সদস্য হতে হলে বাংলাদেশের নাগরিক এবং কমপক্ষে ২৫ বছর বয়সী হতে হয়। অযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে আদালত কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন ঘোষণা, দেউলিয়া, বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হওয়া।[৩] কোনো সংসদ সদস্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হলে তাঁর আসন শূন্য হবে যদি তিনি (ক) সেই দল থেকে পদত্যাগ করেন; বা (খ) সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন।[৪]

আইনসভার গঠন—দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তবে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা ক্রমশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছে। নির্বাহী কার্যাবলির দুর্বল তদারকি, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সংসদ যথাযথ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের কারণে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা এবং সংসদের যাচাই-বাছাই কার্যক্রম লক্ষণীয়ভাবে সীমিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির কারণে জবাবদিহির জায়গাটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

তদুপরি পর্যাপ্ত পর্যালোচনা এবং কার্যকর বিতর্ক ছাড়াই দ্রুত ও দুর্বল আইন প্রণয়নের কারণেও এই এককক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাটি সমালোচিত হয়েছে। সংসদীয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে শাসক দলকে নিপীড়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, যা স্বেচ্ছাচারী আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করেছে। এই ধরনের নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়নের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫ এবং সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১।

তাছাড়া, এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারে নাই।

সুপারিশমালা:

কমিশন বাংলাদেশের এককক্ষীয় আইনসভার কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো মোকাবিলার জন্য একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করছে।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একটি নিম্নকক্ষ ('জাতীয় সংসদ') এবং একটি উচ্চকক্ষের ('সিনেট') সমন্বয়ে গঠিত হবে ।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে সুপারিশমালা

আইনসভার আধিপত্য রোধ করতে উচ্চকক্ষের ভূমিকা

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একটি অতিরিক্ত তত্ত্বাবধায়নমূলক স্তর সংযোজনের মাধ্যমে সংসদে একক কক্ষের নিরঙ্কুশ আধিপত্য এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস করবে। নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ উচ্চকক্ষ দ্বারা নিরীক্ষিত হবে। প্রস্তাবিত বিল মৌলিক মানবাধিকারের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তাও উচ্চকক্ষ নিশ্চিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ার সিনেট (যা অস্ট্রেলিয়ান সংসদের উচ্চকক্ষ) প্রায়ই প্রতিনিধিসভা (House of Representatives যা নিম্নকক্ষ হিসেবে পরিচিত) কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন নিরীক্ষা এবং সংশোধন করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডের শাসনামলে, সিনেট বেশ কয়েকবার অতিমাত্রায় কঠোর বলে বিবেচিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করার সরকারি উদ্যোগকে প্রতিহত করেছিল।[৫]

---

[১] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫

[২] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭২

[৩] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬

[৪] বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০

[৫] ২১ অক্টোবর ২০০২ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার সিনেট 'Australian Security Intelligence Organisation Legislation Amendment (Terrorism) Bill 2002' এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তদন্তের জন্য সিনেটের আইনি ও সাংবিধানিক রেফারেন্স কমিটির নিকট পাঠায়। তদন্ত রিপোর্ট এখানে পাওয়া যাবে: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Completed_inquiries/2002-04/asio_2/report/contents.

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটেরও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস কর্তৃক আইন সংশোধন বা প্রতিহত করার নজির রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৫ সালে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট পুনঃঅনুমোদনের সময়, সিনেট বেশ কয়েকটি সংশোধন এনেছিল, যার মধ্যে সরকারের নজরদারিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর বিচার বিভাগীয় তদারকি বাড়ানোর বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[৬] ফলে দেখা যায় যে উচ্চকক্ষ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যা নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা প্রদান করে।

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

তাছাড়া দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সংসদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে, যা অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন প্রণয়নে সহায়ক হবে। বর্তমানে আইনসভায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সামান্য বা অনুপস্থিত। তবে, উচ্চকক্ষে তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ান সিনেটে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।[৭] এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন, যেমন Native Title Act 1993 পাস হয়েছে, যা তাদের প্রথাগত আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী ভূমির অধিকার স্বীকৃতি দেয়।

কমিশন মনে করে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ প্রান্তিক সম্প্রদায়কে উচ্চকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করা হলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরও সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

নিম্নকক্ষ:

নিম্নকক্ষের গঠনপ্রণালি:

সুপারিশমালা

কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, নিম্নকক্ষ সরাসরি সংখ্যাগোরিষ্ঠ ভোটে, অর্থাৎ, ফার্স্ট পাস্ট দ্য-পোস্ট (FPTP) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

মোট ৪০০ আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০ (একশ)টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন।

রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোয়ন করবে।

সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স ২১ বছরে কমানো উচিত।

দুজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাঁদের মধ্যে একজন বিরোধীদল থেকে নির্বাচিত হবেন। এটি ক্ষমতাসীন দলের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

নিম্নকক্ষের গঠনসংক্রান্ত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা

ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতি:

কমিশন নিম্নকক্ষের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য এফপিটিপি পদ্ধতি অনুসরণ করার সুপারিশ করছে। এফপিটিপি পদ্ধতি একক দলীয় সরকার (single party government) এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে। এর বিপরীতে, **সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** (Proportional Representation - PR) পদ্ধতি প্রায়ই ঝুলন্ত সংসদ, জোট সরকার, এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, নেপাল ২০১৫ সালে নতুন সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে। গত নয় বছরে দেশটিতে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হয়েছে। PR পদ্ধতিতে নিম্নকক্ষ গঠনের ফলে একটি দুর্বল ও বিভক্ত সংসদ সৃষ্টি হয়েছে, যা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ[৮]। আমাদের মতো ভঙ্গুর গণতন্ত্রে বারবার রাজনৈতিক

[৬] 'USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2005'-এর বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য দেখুন: https://sgp.fas.org/crs/intel/RL33332.pdf

[৭] https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Whats_On/Senate_matters/2022/July/Indigenous_Representation_in_the_Senate

[৮] নেপালের নিম্ন কক্ষের ৪০% আসন পিআর পদ্ধতি দ্বারা গঠিত

অস্থিরতা এবং সাংবিধানিক সংকট মোকাবিলা করা কঠিন। এ কারণেই এফপিটিপি পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং কার্যকর শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে।

নারীদের জন্য নির্ধারিত আসন:

বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী মনোয়ন করে। ফলে সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রতি নয়, বরং দলের নেতৃত্বের প্রতি জবাবদিহি করতে বাধ্য হন। এই মনোনয়ন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করে এবং নারীদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের দিকে ঠেলে দেয়। এতে প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বদলে প্রায়শই একটি আনুষ্ঠানিক বা প্রতীকী ভূমিকা পালন করে। ফলে নারী প্রতিনিধিদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়।[৯]

কমিশন প্রস্তাব করছে যে, ১০০টি নির্বাচনী এলাকায় শুধুমাত্র নারী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে নারী সংসদ সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই আসনগুলো দেশের সব জেলা থেকে নির্ধারিত হবে, এবং পুরুষ প্রার্থীরা এই ১০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এই প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং জনগণের কাছে সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, উগান্ডার সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি জেলা থেকে একজন করে নারী প্রতিনিধি সংসদে থাকতে বাধ্য।[১০] কেনিয়ায় ৪৭টি কাউন্টির প্রতিটি থেকে নিবন্ধিত ভোটারদের মাধ্যমে ৪৭ জন নারীকে জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।[১১]

কমিশন নারীদের জন্য নির্ধারিত আসনের সংখ্যা ১০০-তে বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হবে। যা নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে সমতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ন্যূনতম বয়স:

কমিশন নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ন্যূনতম বয়স কমানোর সুপারিশ করেছে। তরুণদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যদি উৎসাহিত করা যায়, তাহলে আরও সক্রিয় ও সচেতন ভোটার সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাছাড়া, তরুণদের অধিকতর অন্তর্ভুক্তি নেতৃত্বে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা ও টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করবে, ফলে ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ শাসন নিশ্চিত হবে। বিশ্বের বহু দেশে ২১ বছর বয়সে পৌঁছালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সিঙ্গাপুরে একজন ব্যক্তি যদি সিঙ্গাপুরের নাগরিক হন এবং মনোনয়নের দিনে তার বয়স অন্তত ২১ বছর হয়, তবে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন।[১২] অস্ট্রেলিয়াতেও প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ন্যূনতম বয়স ২১ বছর।[১৩]

সংসদ সদস্যের একাধিক পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ

কমিশন সুপারিশ করছে যে, একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (অ) প্রধানমন্ত্রী, (আ) সংসদের নেতা, এবং (ই) রাজনৈতিক দলের প্রধান।

এর ফলে এক ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং কর্তৃত্ববাদের সুযোগ রোধ করতে সহজতর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যে, প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে হাউস অব কমন্সের নেতা নন। হাউস অব কমন্সের নেতার দায়িত্ব পৃথক সাংসদের। দায়িত্বের এই পৃথক্করণের ফলে, প্রধানমন্ত্রী সরকারের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন, এবং হাউস অব কমন্সের নেতা সংসদীয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারেন। দায়িত্বের এ ধরনের বিভাজনের ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে বাধা সৃষ্টি করে।

---

[৯] Women's Reserved Seats in Bangladesh: A Systemic Analysis of Meaningful Representation <https://www.ifes.org/publications/womens-reserved-seats-bangladesh-systemic-analysis-meaningful-representation>

[১০] উগান্ডা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৮(১)(খ)

[১১] কেনিয়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৭(১)(খ)

[১২] সিঙ্গাপুরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ দেখুন

[১৩] অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের অধ্যায় ১, পার্ট ৩, অনুচ্ছেদ ৩৪

উচ্চকক্ষ:

উচ্চকক্ষের গঠনপ্রণালি:

সুপারিশমালা

কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষ নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে:

১. উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

২. রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ জন প্রার্থী মনোনীত করবে।

৩. এই ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবে।

৪. অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য নন) ৫ জন প্রার্থী মনোনীত করবেন।

৫. কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠন করলেও জোটের যে সব শরীক নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে আলাদা ভাবে বিবেচনা করে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে তাঁরা উচ্চকক্ষের আসনের জন্যে বিবেচিত হবে। তবে এই বিবেচনার জন্যে যে কোনো দলকে ন্যূনতম ১ (এক) শতাংশ) ভোট লাভ করতে হবে।

৭. উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

৮. উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় সদস্য ব্যতীত অন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

৯. উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিম্নকক্ষের সদস্যদের মতোই মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

উচ্চকক্ষের গঠনসংক্রান্ত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা:

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation -PR) পদ্ধতি:

নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচনে FPTP পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নকক্ষে FPTP - এর ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ব্যবহারের প্রস্তাব যৌক্তিক এবং ন্যায় সঙ্গত।

উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি নিম্নকক্ষের এফপিটিপি পদ্ধতির কঠোরতা হ্রাস করতে সহায়ক হবে। এফপিটিপি পদ্ধতি সাধারণত বড় দলগুলোর পক্ষে কাজ করে এবং ছোট দলগুলোকে প্রান্তিক করে তুলে, যা একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। অন্যদিকে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে, ভোটারদের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন আকারের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য ও সহযোগিতার সুযোগ প্রদান করে।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের কাঠামোতে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির ব্যবহার বেশ কার্যকর। উদাহরণ হিসেবে, অস্ট্রেলিয়ার সিনেট প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (PR) পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে প্রতিনিধি পরিষদ ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়। এর ফলে, সিনেট একটি প্রতিনিধিত্বশীল উচ্চকক্ষ হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিনিধি পরিষদ স্থিতিশীল ও কার্যকর নিম্নকক্ষ হিসেবে ভূমিকা পালন করে। একইভাবে, ভারতের দ্বিকক্ষব্যবস্থাও মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধা কাজে লাগায়। রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ) প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়, যা বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সংখ্যালঘু স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়। অন্যদিকে, লোকসভা (নিম্নকক্ষ) ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের সহায়ক হয়। এই মিশ্র পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো—এটি উভয় পদ্ধতির সুবিধা নিশ্চিত করে। উচ্চকক্ষে প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়, আর নিম্নকক্ষে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি কার্যকর সরকার গঠনের ভিত্তি রাখে। এর ফলে, আইনসভা ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চকক্ষে আসন সংরক্ষণ

সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য আসন সংরক্ষণ করার বিধান অনেক দেশের আইনেই রয়েছে। নিউজিল্যান্ডে, স্থানীয় মাওরি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নিউজিল্যান্ড পার্লামেন্টে ৭টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে।[১৪] নেপালের সংবিধান নারীদের, দলিতদের, স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর, মাধেশিদের এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে।[১৫] ভারতের সংবিধান লোকসভা (নিম্নকক্ষ) এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে তফসিলি জাতি (Scheduled Castes- SCs) এবং তফসিলি জনজাতি (Scheduled Tribes- STs)'র জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। [১৬].

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চকক্ষে ৫টি আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে। ফলে আইন প্রণয়নের সময় তাদের মতামতকে যুক্ত করা যেতে পারে।

উচ্চকক্ষে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চকক্ষে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থা অনেক দেশের শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব, শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় (Council of States) ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন, যাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সামাজিক সেবায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।[১৭] একই ভাবে, ইতালিতে রাষ্ট্রপতি পাঁচজন নাগরিককে আজীবন সিনেটর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন, যাঁরা সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্পকলা বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে জাতিকে সম্মানিত করেছেন।[১৮]এ ধরনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্যকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

ন্যূনতম নির্বাচনী থ্রেশহোল্ডের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব

পিআর পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করতে হবে। এই ন্যূনতম নির্বাচনী থ্রেশহোল্ডের লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব রক্ষা করার পাশাপাশি আইনসভায় অতিরিক্ত বিভাজন (excessive fragmentation) প্রতিরোধ করা। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানির ফেডারেল ইলেক্টোরাল অ্যাক্ট (Bundeswahlgesetz) অনুসারে, বুন্ডেজট্যাগে (Bundestag) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পেতে দলগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় ভোটের (Zweitstimmen) অন্তত ৫% পেতে হবে বা সরাসরি তিনটি আসনে জয়লাভ করতে হবে[১৯] ।

কমিশন সুপারিশ করেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী জোট গঠন করলেও জোটের যে সব শরীক নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করবে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের হিসাব আলাদা ভাবে বিবেচনা করে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে তাঁরা উচ্চকক্ষের আসনের জন্যে বিবেচিত হবে। তবে এই বিবেচনার জন্যে যে কোনো দলকে ন্যূনতম ১ (এক) শতাংশ) ভোট লাভ করতে হবে।

এ ধরনের একটি ব্যবস্থার ফলে ছোট রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারবে, এবং রাজনৈতিক দলগুলো কৌশলগত জোট গঠনে উৎসাহিত হবে। ফলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হবে।

উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

কমিশন সুপারিশ করছে যে উচ্চকক্ষের নিম্নলিখিত দায়িত্ব থাকবে:

আইনগত নিরীক্ষা

সুপারিশমালা:

১. উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে নিম্নকক্ষে পাসকৃত অর্থবিল ব্যতীত সকল বিল উভয় কক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে।

২. আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত নিম্নকক্ষের বিল উচ্চকক্ষ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে।

[১৪] মাউরি রেপ্রেজেনটেইশন অ্যাক্ট ১৮৬৭

[১৫] নেপালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৪ ও ১৭৬

[১৬] ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩০

[১৭] ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮০

[১৮] ইতালির সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯

[১৯] https://bundeswahlleiterin.de/en/dam/jcr/4ff317c1-041f-4ba7-bbbf-1e5dc45097b3/bundeswahlgesetz_engl.pdf

যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে:

৩. সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাসকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে।

যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে:

৪. সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

৫. নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাসকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখ্যান করে এবং নিম্নকক্ষ যদি এটি আবারও পরবর্তী অধিবেশনে পাস করে, তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো যেতে পারে।

৬. উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না।

আইনগত নিরীক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা

উভয় কক্ষের মধ্যে আলোচনা এবং সমঝোতা

কমিশন সুপারিশ করছে যে, উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে পাস হওয়া কোনো বিল সংশোধনীর জন্য ফেরত পাঠাতে পারবে। এই ব্যবস্থা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দুই কক্ষের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতাকে উৎসাহিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে নিম্নকক্ষে (Bundestag) প্রস্তাবিত কোনো আইন নিয়ে উচ্চকক্ষ (Bundesrat) দ্বিমত পোষণ করলে তারা মধ্যস্থতা কমিটির (Mediation Committee) আহ্বান করতে পারে।[২০] উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এই যৌথ সংস্থা পারস্পরিক পার্থক্য নিরসন এবং উভয় পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান নিশ্চিত করতে কাজ করে।[২১]

উচ্চকক্ষের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ফলে অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে **অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট** (ACA) কেবল তখনই পাস হয়েছিল, যখন সিনেট কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চূড়ান্ত সংস্করণটির জন্য উভয় কক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছিল, যা আইনসভার উভয় কক্ষের ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করে।[২২]

উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষে পাসকৃত বিল বিলম্বিত করতে পারে, তবে তা স্থায়ীভাবে বাধা দিতে পারবে না। ফলে উচ্চকক্ষ আইনসভার আইন প্রণয়ন কাজ ব্যাহত করতে পারবে না। যুক্তরাজ্যে উচ্চকক্ষ (House of Lords) নিম্নকক্ষ (House of Commons) কর্তৃক পাসকৃত আইন বিলম্বিত করতে পারে, তবে তা চূড়ান্তভাবে বাধা দিতে পারে না।[২৩] উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সালে হাউস অব কমন্স ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে শিয়াল শিকার নিষিদ্ধ করার জন্য হান্টিং অ্যাক্ট ২০০৪ (Hunting Act, 2004) পাস করে, যদিও হাউস অব লর্ডস এটি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছিল।

উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়ন প্রস্তাবের ক্ষমতা থাকবে না

নিম্নকক্ষ সরাসরি নির্বাচিত বিধায় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ কেবল নিম্নকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এর ফলে দুই কক্ষের মধ্যে সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ এবং আইন প্রণয়নে অচলাবস্থা প্রতিরোধ করা যাবে। তাছাড়া, উচ্চকক্ষ মূলত একটি পর্যালোচনাকারী সংস্থা যা নিম্নকক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিলসমূহ পর্যালোচনা, সংশোধন এবং অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে।

অর্থ বিল

অর্থ বিলের জন্য উচ্চকক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। এটি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভারতসহ অনেক আইনব্যবস্থায় প্রচলিত একটি নীতি। যেহেতু নিম্নকক্ষ সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই দায়বদ্ধ, সুতরাং, জনসাধারণের অর্থব্যবস্থার ওপর একক নিয়ন্ত্রণ নিম্নকক্ষের থাকা উচিত। যুক্তরাজ্যে, স্পিকার দ্বারা প্রত্যায়িত কর আদায় বা সরকারি ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত অর্থ বিল কমন্স সভায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং এটি লর্ডস সভায় উপস্থাপনের এক মাসের মধ্যে Royal Assent পেতে হয়, এবং এ বিষয়ে লর্ডস সভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

---

[২০] https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legislation/mediation-245702

[২১] ২০১৯ সালে বুন্দেস্ট্যাগ দ্বারা পাস করা একটি জলবায়ু সুরক্ষা প্যাকেজ বুন্দেসরাট দ্বারা মধ্যস্থতা কমিটির কাছে রেফার করা হয়েছিল। বুন্দেসরাটের দাবি ছিল ফেডারেল-রাষ্ট্রীয় আর্থিক বিবেচনায় নিয়ে প্যাকেজটি পরিবর্তন করা হোক। মধ্যস্থতা কমিটি একটি সমঝোতা করেছিল যা উভয় চেম্বারই গ্রহণ করেছিল।

[২২] https://affordablecareactlitigation.com/wp-content/uploads/2018/09/llj_105n2_cannan.pdf

[২৩] পার্লামেন্ট অ্যাক্ট, ১৯১১ এবং পার্লামেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৯

সংবিধান সংশোধনী

সুপারিশসমূহ:

কমিশন সংবিধান সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অনুসরণের সুপারিশ করছে:

১. সকল সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রেই উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২. প্রস্তাবিত সংশোধনী উভয় কক্ষে পাস হলে এটি গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। গণভোটের ফলাফল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৩. যদি প্রস্তাবিত সংশোধনীর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে গণভোটের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে তার সম্মতি প্রদান করতে হবে, এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর সংশোধনী কার্যকর হবে।

সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত সুপারিশের যৌক্তিকতা

উভয় কক্ষেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট

বাংলাদেশের সংবিধান বহুবার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাসকৃত সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনায় 'সংশোধনী' বিষয়ক আলোচনা দেখুন)। সংবিধান সংশোধনের পূর্বশর্ত হিসেবে কমিশন উভয় কক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সুপারিশ করছে। উচ্চকক্ষের এ ধরনের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক সংশোধনী পাস রোধ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাবের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট উভয়েই দুই-তৃতীয়াংশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হয়।[২৪] জার্মানির মৌলিক আইন সংশোধনের জন্য বুন্ডেসটাগ (ফেডারেল ডায়েট) এবং বুন্ডেসরাট (ফেডারেল কাউন্সিল) উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়।[২৫] ইতালিতে, সংবিধান সংশোধনীর জন্য একটি জটিল দ্বিকক্ষীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ইতালির সংবিধান (১৯৪৮) অনুযায়ী সংবিধানের সংশোধনীর জন্য Chamber of Deputies (নিম্নকক্ষ) এবং Senate (উচ্চকক্ষ) উভয় কক্ষে দুবার করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পাস করতে হবে, অন্যথায় গণভোটের প্রয়োজন হয়।[২৬] এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শর্তাবলির কারণে সংবিধান সংশোধনের জন্য বৃহত্তর রাজনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন হয়। ফলে, আইনপ্রণেতারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

গণভোট

সংবিধানের কোনো সংশোধনী পাস হওয়ার আগে এটি গণভোটে উপস্থাপন করতে হবে। সংবিধানের সব ধরনের সংশোধনী গণভোটে উপস্থাপন করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া[২৭], আয়ারল্যান্ড[২৮] এবং জাপানে[২৯] এই ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

আইনসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি গণভোটের বাধ্যবাধকতা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা সাংবিধানিক সংশোধনীর ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে, ইতালির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও রেনজি সিনেটের ক্ষমতা এবং আকার হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন। সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল কারণ এটি নিম্নকক্ষ এবং নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত করেছিল। সংশোধনীটি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নিম্নকক্ষ (চেম্বার অব ডেপুটিজ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) পাস করেছিল, কিন্তু গণভোট এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সংশোধনীটি গণভোটে উপস্থাপিত হয়। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালির ভোটাররা বড় ব্যবধানে সংশোধনীটি প্রত্যাখ্যান করেন (৫৯% "না" ভোট পড়ে)। এই পরাজয়টি রেনজির সরকারকে প্রত্যাখ্যান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

---

[২৪] যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ V

[২৫] জার্মান বেসিক ল'র (Grundgesetz) অনুচ্ছেদ ৭৯(২)

[২৬] ইতালির সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮

[২৭] অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানদের ধারা ১২৮

[২৮] আয়ারল্যান্ড সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬

[২৯] জাপান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬

চুক্তি অনুমোদন

সুপারিশসমূহ:

কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, (অ) বিদেশি রাষ্ট্র, (আ) আন্তর্জাতিক সংস্থা, (ই) বিদেশি সরকার, (ঈ) বিদেশি কোম্পানি, বা (উ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে কোনো চুক্তি নিম্নকক্ষে উপস্থাপিত হতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে আইনসভার উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নিতে হবে।

চুক্তি অনুমোদনসংক্রান্ত বিষয়াবলির যৌক্তিকতা

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি করার ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে স্থলসীমা চুক্তি সম্পাদন করে কিন্তু তিন বিঘা করিডোরের মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলে বাংলাদেশি নাগরিকগণের অবাধ প্রবেশাধিকারের বিষয়টি সমাধান না করায় সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে। আবার ২০১৭ সালে, বাংলাদেশ আদানির সাথে একটি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করে, যা ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। চুক্তিটির অসম বিধান সরকারকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছিল।[৩০] এই প্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে যে, জাতীয় স্বার্থের বিপরীতে চুক্তি সম্পাদন রোধকল্পে আইনসভার নজরদারি অত্যাবশ্যক।

প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে (যেমন জার্মানি, জাপান এবং ফ্রান্স) চুক্তি অনুমোদনের জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের সম্মতির প্রয়োজন। এই পদ্ধতি জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষায় আইনসভার নজরদারি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে শান্তি, বাণিজ্য বা ভূখণ্ড সম্পর্কিত চুক্তির জন্য সংসদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।[৩১] যুক্তরাজ্যেও আন্তর্জাতিক চুক্তির ওপর সংসদীয় নজরদারির বিধান রয়েছে। ২০১০ সালের সংবিধান সংস্কার ও প্রশাসন আইন অনুসারে, এরূপ চুক্তি সংসদে ২১ দিনের জন্য উপস্থাপন করা হয়, এবং এই সময়ের মধ্যে যেকোনো কক্ষ আপত্তি উত্থাপন করতে পারে।

কমিশন মনে করে, উভয় কক্ষের পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ফলে যেকোনো চুক্তির ব্যাপক পরীক্ষণ সম্ভব, যা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করবে। চুক্তি সম্পর্কে গভীর আলোচনা ও বিবেচনার সুযোগও এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত হয়।

অভিশংসন

সুপারিশমালা

কমিশন অভিশংসনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করছে:

১. রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যেতে পারে।

২. লিখিতভাবে নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষরে অভিশংসন প্রস্তাব আনার অভিপ্রায় জানিয়ে নোটিশের মাধ্যমে নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রস্তাবটি নিম্নকক্ষের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের কম নয় এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অবশ্যই পাস হতে হবে।

৩. নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে বিচার শুরু হবে। এখানে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত শুনানির সকল অধিকার থাকবে।

৪. উচ্চকক্ষ অভিশংসন বিচার পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে সাক্ষ্য–প্রমাণ গ্রহণ করা এবং শুনানি পরিচালনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

৫. বিচার কার্যক্রম শেষে উচ্চকক্ষ উপস্থাপিত সাক্ষ্য–প্রমাণ এবং যুক্তি বিবেচনা করবে। রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে কি না, সে বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রপতিকে দোষী সাব্যস্ত অথবা অপসরণ করতে উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।

---

[৩০] চুক্তির সমালোচনার জন্য বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (BEN) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দলোন (BAPA) এর যৌথ বিবৃতি দেখুন: https://ben-global.net/bapa-and-ben-demand-the-cancellation-of-the-power-import-deal-with-indias-adani-group/

[৩১] ফরাসি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৩

অভিশংসন সম্পর্কিত সুপারিশমালার যৌক্তিকতা

কমিশন রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের প্রক্রিয়ায় উচ্চকক্ষের ভূমিকা সুপারিশ করছে। অভিশংসন নির্বাহী বিভাগের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যদি রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান তাদের কর্তৃত্বের সীমা লঙ্ঘন করেন বা অসদাচরণে লিপ্ত হন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে আইনসভা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের তুলনায় বেশি পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে পারে। ফলে নির্বাহী ব্যক্তিদের অভিশংসন প্রক্রিয়া ন্যায়সংগত এবং স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে উচ্চকক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

২০১৬ সালে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ আর্থিক অব্যবস্থাপনা এবং সরকারি হিসাবে কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। সিনেট তাকে অভিশংসিত করে পদ থেকে অপসারণ করে।[১] ২০১৭ সালে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক গিউন-হাই ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির অভিযোগে জাতীয় পরিষদ দ্বারা অভিশংসিত হন। সংবিধানিক আদালত অভিশংসন সমর্থন করলে তাকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়।[২] ২০২৪ সালে, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়ল সামরিক আইন আরোপের ব্যর্থ চেষ্টার কারণে জাতীয় পরিষদ দ্বারা অভিশংসিত হন।[৩] অর্থাৎ, অভিশংসন নির্বাহী শাখার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একটি কার্যকর মাধ্যম।

১ https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37237513

২ https://www.reuters.com/article/world/timeline-south-koreas-impeached-president-park-geun-hye-idUSKBN16H09W/

৩ https://www.bbc.com/news/live/c1wq025v421t

নির্বাহী বিভাগ

১. সরকারের প্রকৃতি

ব্যাখ্যা

(ক) বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রথম থেকেই এক ব্যক্তি শাসিত সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কখনো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কিংবা সংসদীয় ব্যবস্থার আদলে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার। প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সমস্ত কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করতে বাধ্য থাকেন যার ফলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করার সুযোগ থাকে না। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী তার আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা সংসদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে বৈধতা দেয়ার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এ ব্যবস্থায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক চর্চা কার্যত অনুপস্থিত ।

(খ) গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং কার্যকরী ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু কমিশন একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুপারিশ করেছে সেই মর্মে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনেই সরকার গঠন করবে বলে সুপারিশ করেছে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রাহী না করে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট ভাবে সংবিধানে উল্লেখ থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(গ) সংবিধানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় অতীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনা সম্ভব হয়নি। দেশের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় অতীব জরুরী। এর মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত চাহিদার বাস্তবিক রূপায়ণ সম্ভব। এই মর্মে, কমিশন রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি সমন্বিত সংস্থা, যা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নামে পরিচিত হবে, গঠন করার সুপারিশ করছে।

সুপারিশ

১.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

১.২ কমিশন রাষ্ট্রপতির কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের সুপারিশ করছে যা ৩.৩ (রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব এবং কার্যাবলী) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করবেন।

১.৩ কমিশন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] গঠনের সুপারিশ করছে । এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী, বিশেষ করে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ সংস্থার প্রধানদের নিয়োগ সম্পাদন করবে।

২. জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল

ব্যাখ্যা

(ক) যদিও সকল সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয় সংস্থা কিন্তু বাস্তবে তা নির্বাহী বিভাগের অধীন হওয়ায়, দলীয় সরকারের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়। এ প্রভাব থেকে সাংবিধানিক সংস্থাগুলিও ব্যতিক্রম নয়। ফলে বিদ্যমান সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্র ও দলীয় সরকার একাকার হয়ে যায়। তাই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে রাষ্ট্রের সকল অঙ্গের সমন্বয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে একটি সমন্বিত রাষ্ট্রীয় সংস্থা অতীব প্রয়োজন।

(খ) জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ("এনসিসি") হবে রাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক কলেজিয়াল বা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করবে এবং শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্রের অঙ্গসমূহ ও সরকারের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এনসিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এনসিসি রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে সাংবিধানিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) ফ্রান্স, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, ঘানা, কম্বোডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং কাজাখস্তানসহ বিশ্বের অনেক দেশের সংবিধান বিভিন্ন আদলে সাংবিধানিক কাউন্সিলের ধারণা গ্রহণ করেছে।

(ঘ) এনসিসির গঠনে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। নির্বাহী বিভাগের পাশাপাশি কাউন্সিলের কাঠামোতে বিচার বিভাগ এবং আইনসভার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রধান বিচারপতি, আইনসভার দুই কক্ষের স্পিকারগণ, বিরোধী দল মনোনীত ডেপুটি স্পিকারগণ এবং বিরোধীদলীয় নেতাকে সম্পৃক্ত করে কাউন্সিলটি প্রতিনিধিত্বশীল করা হয়েছে। আইনসভার প্রধান দুই দলকে বাদ দিয়ে অন্য সকল সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করায় জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঙ) অধিকাংশ সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিসি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বাহী বিভাগের তথা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর একক নিরংকুশ আধিপত্য থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে গ্রহযোগ্য ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। সংবিধান প্রদত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্যে এনসিসি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

(চ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে কোনো রাজনৈতিক ও জাতীয় সংকটে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বা দিকনির্দেশনা দিতে এনসিসি হবে একটি অনন্য আশ্রয়স্থল।

সুপারিশ

জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল ["এনসিসি"] রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

২.১ এনসিসি গঠন (আইনসভা বহাল অবস্থায়)

২.১.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি-র সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধানমন্ত্রী

(ই) বিরোধীদলীয় নেতা

(ঈ) নিম্নকক্ষের স্পিকার

(উ) উচ্চকক্ষের স্পিকার

(ঊ) প্রধান বিচারপতি

(ঋ) বিরোধী দল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ও) বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার

(ঔ) প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের বাকি সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১(এক) জন। উক্ত ভোট আইনসভার উভয় কক্ষের গঠনের তারিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

২.১.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন।

২.২ এনসিসি গঠন (আইনসভা না থাকলে)

২.২.১ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এনসিসি এর সদস্য হবেন:

(অ) রাষ্ট্রপতি

(আ) প্রধান উপদেষ্টা

(ই) বিচারপতি

(ঈ) প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের ২ (দুই) জন সদস্য

২.২.২ প্রধানমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সাথে সাথে এনসিসি গঠনে অনুচ্ছেদ ২.১.১ প্রযোজ্য হবে।

২.৩ কার্যাবলী

২.৩.১ নিয়োগ

এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে:

(অ) নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(আ) অ্যাটর্নি জেনারেল

(ই) সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঈ) দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(উ) মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঊ) প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার

(ঋ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধান

(এ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ।

২.৩.২ এনসিসি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম প্রেরণ করবে।

২.৩.৩ এনসিসি সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আইনসভা আইন দ্বারা এনসিসিকে অতিরিক্ত কার্যভার অর্পণ করতে পারবে।

২.৪ সভা এবং কর্ম পদ্ধতি

২.৪.১ এনসিসি প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একটি সভা আয়োজন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এনসিসি-র ৩ (তিন) সদস্যের লিখিত অনুরোধে রাষ্ট্রপতি জরুরী সভা আহ্বানে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতি নিয়মিতভাবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি, এনসিসির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২.৪.২ সংবিধানে ভিন্ন কিছু উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত সিদ্ধান্ত এনসিসির মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নিতে হবে।

২.৪.৩ মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিতি এনসিসি-র সভার কোরাম হবে।

২.৪.৪ এনসিসি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় রুলস তৈরি করবে।

৩. রাষ্ট্রপতি

ব্যাখ্যা

(ক) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। আবার রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হলে সরকার দলীয় প্রার্থী ছাড়া কারো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এমতবস্থায়, বাংলাদেশের সকল জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটের সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে এবং রাষ্ট্রপতিকে গণতান্ত্রিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এতে যোগ্য ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপতি নিবাচনে অংশ নিতে আগ্রহী হবেন। রাষ্ট্রপতি নিবাচনে ভূমিকার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আরো গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী হবে।

সুপারিশ

৩.১ পদমর্যাদা ও যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকবেন। কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(অ) ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের হন; অথবা

(আ) আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হন; অথবা

(ই) কখনও সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত না হন।

৩.২ নির্বাচন এবং মেয়াদ

৩.২.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে -

(অ) আইনসভার উভয় কক্ষের প্রতিটি সদস্যদের একটি করে ভোট;

(আ) প্রতিটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণ: ৬৪ টি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' থাকলে ৬৪ টি ভোট];

(ই) প্রতিটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' এর সামষ্টিক ভাবে একটি করে ভোট।

৩.২.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমন্বয় কাউন্সিলের সকল সদস্য মিলে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাকে সর্বোচ্চ ভোট দিবেন তিনি একটি ভোট পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। একটি সমন্বয় কাউন্সিলের প্রদত্ত ভোটে যদি একাধিক রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট পান, তবে সেই সমন্বয় কাউন্সিলে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে। পুনরায় অনুষ্ঠিত ভোটে সমন্বয় কাউন্সিলের সদস্যগণ শুধুমাত্র সমসংখ্যক সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত পদপ্রার্থীদেরকেই ভোট দিতে পারবেন। সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩.২.৩ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না।

৩.৩ দায়িত্ব এবং কার্যাবলী

৩.৩.১ কমিশন সুপারিশ করছে যে, রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করবেন:

(অ) প্রধান বিচারপতি।

(আ) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক।

(ই) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক।

(ঈ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

(উ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদ।

৩.৩.২ আইনসভা ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার নিয়োগ করবেন।

৩.৪ অভিশংসন

কমিশন সুপারিশ করছে যে, **আইনসভার প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অনুন্য দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের মাধ্যমে** সংবিধানের আইনসভা অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে **রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করা যাবে।**

৪. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

ব্যাখ্যা

(ক) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কেবল নিম্নকক্ষ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। তাই, শুধুমাত্র জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনেই একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সরকার গঠন করবেন।

(খ) বিদ্যমান সংবিধান প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের উপর কোনো সীমা আরোপ করে না যা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যক্তির চিরস্থায়ী কর্তৃত্ববাদের সুযোগ সৃষ্টি করে। আমাদের সংবিধানে সুস্থ গণতন্ত্র চর্চাকে বিকশিত করা ও স্থায়ী রূপ দিতে একজন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা সর্বোচ্চ দুই বারের সীমা আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত দুই বারের সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(গ) সংসদ ভেঙে[৪] দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপর অর্পিত ক্ষমতা ১৯৭২ সালের গণপরিষদে[৫] উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দেয়। জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করে বলেন,- প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা গণতন্ত্রের স্পিরিট এর সাথে বেমানান, যা স্বৈরতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী যখন জাতীয় সংসদের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তখন একতরফা ভাবে নির্বাচিত সংসদ ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করার ক্ষমতা বাঞ্চনীয় নয়। তাই বিকল্প ব্যক্তি জাতীয় সংসদের আস্থা নিয়ে সরকার গঠন করার সুযোগ থাকলে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে সংসদ ভেঙে দেয়ার বাধ্যবাধকতা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করবে।

(ঘ) বর্তমানে, মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো মন্ত্রীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা থাকায় এই দায়বদ্ধতা অর্থহীন। উপরন্তু ফ্লোর ক্রসিং বিষয়ে[৬] সংবিধানের অবস্থানের কারণে কার্যত সংসদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জিম্মি। ১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্কের সময়, জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রীদের সংসদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধতার কারণে একজন মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

সুপারিশ

কমিশন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

৪.১ প্রধানমন্ত্রী

৪.১.১ আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন।

৪.১.২ নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

৪.১.৩ আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোট হেরে যান কিংবা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা স্পষ্ট হয় যে নিম্নকক্ষের অন্য কোনো সদস্য সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন পাবে না, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ এক সাথে ভেঙে দেবেন।

৪.১.৪ একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনো ভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্যে এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪.২ মন্ত্রীগণ

মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত এবং মন্ত্রিসভা যৌথভাবে আইনসভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হবেন।

---

[৪] অনুচ্ছেদ ৫৭(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[৫] পৃষ্ঠা ২২৮, গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৭২, দ্বিতীয় অংশ

[৬] অনুচ্ছেদ ৭০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৪.৩ আইনসভার সদস্য

কমিশন আইনসভার সদস্য পদ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে-

৪.৩.১ কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন কোনো সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪.৩.২ কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি দায়িত্ব ব্যতিরেকে আইনসভা সদস্যের কোনো ভূমিকা থাকবে না।

৫. অন্তর্বর্তী সরকার

ব্যাখ্যা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি পরীক্ষিত এবং কার্যকর ব্যবস্থা। এ যাবত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেলেও তা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে বিতর্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাতিল হলেও, বিগত বছরগুলোর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের জনগণ এ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে অভূতপূর্ব সমর্থন ও দাবি জানিয়েছে। কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামের স্থলে অন্তর্বর্তী সরকার নামকরণের সুপারিশ করেছে। কমিশন মনে করে রাষ্ট্রপতির একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এনসিসি প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করবে।

সুপারিশ

কমিশন আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করছে যার কাঠামো, দায়িত্ব এবং মেয়াদ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে -

৫.১ এই সরকারের প্রধান 'প্রধান উপদেষ্টা' বলে অভিহিত হবেন। যিনি ৫.৩ অনুচ্ছেদে বর্নিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।

৫.২ অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।

৫.৩ প্রধান উপদেষ্টা

কমিশন সুপারিশ করছে যে, নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে-

৫.৩.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজনকে এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

৫.৩.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৫.৩.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই

ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৫ অনুযায়ী যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৩.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৫.৩.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একই ভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক যাকে পাওয়া যায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

৫.৪ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হবার পর তিনি আইনসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এমন অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন করবেন।

৫.৫ কার্যাবলী

অন্তর্বর্তী সরকার সকল রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে।

৫.৬ প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুবরণ করলে বা প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হারালে উপদেষ্টা পরিষদ তাদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে মনোনীত করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিবেন।

৬. স্থানীয় সরকার

ব্যাখ্যা

(ক) সমগ্র দেশে সমন্বিত উন্নয়নের জন্য কার্যকর এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ("এলজিআই") গুলোকে সত্যিকারের কার্যকরী করার প্রয়োজনে তাদের আর্থিক এবং বাস্তবায়নিক স্বায়ত্তশাসন অতীব জরুরী। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রশাসনকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে এনে জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করা প্রয়োজন।

(খ) আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত করতে এবং স্বচ্ছতা আনয়নে প্রতিটি এলজিআই আইনসভার উচ্চকক্ষের স্থানীয় সরকার কমিটির মাধ্যমে তাদের বাজেট অনুমোদন করাতে পারবেন। তবে যদি কোনো এলজিআই নিজস্ব তহবিলেই বাজেটের অর্থ সংকুলান করতে পারে তবে তার কারো অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(গ) প্রতিটি স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। প্রতিটি জেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করার সুবিধা সৃষ্টি করতে, একটি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল গঠন করা হবে। জেলা সমন্বয় কাউন্সিল প্রতিটি এলজিআই এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। জেলা সমন্বয় কাউন্সিল পুরো জেলার সার্বিক উন্নয়ন এবং এলজিআই সমূহের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উপরন্তু, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের পরোক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল একটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

সুপারিশ

৬.১ ক্ষমতায়ন

৬.১.১ কমিশন সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ("এল.জি.আই.") আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে। জাতীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই-এর) সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে।

৬.১.২ কমিশন সুপারিশ করছে, যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে । এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।

৬.১.৩ তহবিল ও বাজেট

(অ) এলজিআই ট্যাক্স, চার্জ, ফি ইত্যাদি আরোপ করে স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। সংগৃহীত তহবিল তার বাজেটের বেশি হলে, উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে রাখা হবে।

(আ) যদি প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। উক্ত বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে বাজেটে উল্লেখিত ঘাটতি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেবে।

(ই) আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, আইনসভার একটি নতুন উচ্চকক্ষ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত, কমিটির সকল কার্যাবলী স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

৬.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

কমিশন দক্ষ এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করতে, সকল স্তরের এলজিআই সংবিধানে উল্লেখ থাকার সুপারিশ করছে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত এলজিআই থাকবে-

(অ) বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

(আ) বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা পরিষদ;

(ই) পৌরসভা; এবং

(ঈ) সিটি কর্পোরেশন।

৬.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

কমিশন প্রতিটি জেলায়, একটি 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। সিটি কর্পোরেশন 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর অংশ হবে না, কেননা অনুরূপ উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে। 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর কাঠামো, দায়িত্ব এবং কাজের পরিধি প্রসঙ্গে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করছে -

৬.৩.১ 'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' একটি নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর নিম্নলিখিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে -

(অ) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান

(আ) প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র

(ই) প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান

'জেলা সমন্বয় কাউন্সিল' এর সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন, যারা প্রত্যেকে এক বছর মেয়াদে কাউন্সিলের সভায় পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৬.৩.২ প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের একটি 'সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল' থাকবে যা মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও সকল কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

৬.৩.৩ জেলা সমন্বয় কাউন্সিলের নিম্নলিখিত কার্যাবলী থাকবে-

(অ) সমগ্র জেলা বা জেলার মধ্যে একাধিক এলজিআই-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় করা এবং এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি এলজিআই থেকে তহবিল বরাদ্দের সমন্বয় করা।

(আ) জেলার অন্তর্গত প্রতিটি এলজিআই-এর বাজেট প্রণয়নে সহায়তা ও তহবিল সংগ্রহে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

(ই) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উপরোল্লিখিত ৩.২.১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) এর অংশ হিসেবে ভোট প্রদান করা।

(ঈ) আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সকল কার্য সম্পাদন করা।

৬.৪ নির্বাচন

(অ) কমিশন স্থানীর সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ না করার সুপারিশ করছে।

(আ) কমিশন এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করছে।

৬.৫ স্থানীয় সরকার কমিশন

৬.৫.১ কমিশন একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।

৬.৫.২ কমিশন সুপারিশ করছে যে, -

(অ) স্থানীয় সরকার কমিশন সকল এলজিআই তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

(আ) স্থানীয় সরকার কমিশনের কাছে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা থাকবে এবং প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরূদ্ধে স্থগিতাদেশ বা অপসারণসহ যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(ই) এলজিআই সমূহের মধ্যে, কিংবা এলজিআই বা কোনো সরকারি বিভাগ কর্তৃক একে ওপরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাসহ অন্য যে কোনো অভিযোগ করলে, স্থানীয় সরকার কমিশনের উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

বিচার বিভাগ

ভূমিকা:

১। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ প্রধানত সুপ্রিম কোর্ট এবং 'অধস্তন আদালত' নিয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত: আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়ানি, ফৌজদারি, রিট এবং বিধিবদ্ধ এখতিয়ার রয়েছে। বিশেষ মূল এখতিয়ারের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা রাখে। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগের নিচে রয়েছে বিভিন্ন 'অধস্তন আদালত' এবং দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং বিশেষ এখতিয়ারসম্পন্ন ট্রাইব্যুনাল।

ন্যায়বিচারের সুযোগ

২। 'ন্যায়বিচারের সুযোগ' (এ্যাকসেস টু জাস্টিস) বলতে বোঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। তবে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে ন্যায়বিচারের সুযোগ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়া এবং তা শুধুমাত্র রাজধানীতে অবস্থান। ফলে দেশের একটি বৃহৎ অংশ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা, আইনি প্রতিকারের জন্যে বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে নিরুৎসাহিত হন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জবাবদিহি

৩। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ, বিচারকদের নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব, সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ, বিচারকদের বিরুদ্ধে দলীয় বিবেচনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট প্রয়োগ এবং পক্ষপাতমূলক বিচারিক সিদ্ধান্তের দ্বারা জর্জরিত হয়েছে - যার সবগুলোই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিকে খর্ব করেছে। যদিও ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দিয়েছিল যে, বিচার বিভাগীয় পরিষেবাগুলির প্রশাসনিক কার্যক্রম সরকারের নির্বাহী বিভাগের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে[১], তবু বিচার বিভাগ এখনো একটি সত্যিকার স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারেনি। কেননা, 'অধস্তন আদালত' এখনো নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক, পরিচালন, লজিস্টিক ও অন্যান্য ব্যয়ভারের জন্য নির্বাহী শাখার ওপর নির্ভরশীলতা এই পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে।

৪। **সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ:** সুপ্রিম কোর্ট রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণে নাগরিকদের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক হাইকোর্ট বিভাগ ন্যায্যতাভিত্তিক ন্যায়বিচার প্রদান করার জন্য যথার্থ বা বাস্তবসম্মত নয়।

সুপারিশসমূহ

৫। কমিশন উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করছে।

৬। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন স্থায়ী আসন স্থাপন করা হবে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবেই সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

উক্ত সুপারিশের যৌক্তিকতা

৭। একটি বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো গ্রামীণ, প্রত্যন্ত বা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগণের জন্য ন্যায়বিচারে সুযোগের উন্নতি। ন্যায়বিচারের সুযোগের ক্ষেত্রে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিচারিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলে তা সুযোগ, কার্যকারিতা এবং দ্রুত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। ন্যায়বিচার সহজলভ্য ও দক্ষ হলে বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা গেলে জনগণ বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নাগালের মধ্যে আছে এমনটা বিবেচনা করবে। এটি ন্যায়পরায়ণতা এবং জবাবদিহি রক্ষায় আইনি ব্যবস্থার সক্ষমতার প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করবে।

৮। কেন্দ্রীভূত আদালত বিপুলসংখ্যক মামলার চাপ এবং লজিস্টিক সমস্যায় জর্জরিত থাকার কারণে ন্যায়বিচার প্রদানে বিলম্ব করে। হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ এই কাজের চাপকে নানা অঞ্চলে ভাগ করে দেবে, ফলে মামলাগুলো অধিক দক্ষতা এবং

[১] Secretary, Ministry of Finance vs Masdar Hossain, 52 DLR (AD) 2000, 82.

দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা যাবে। এটা কেবল বিচারপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে না, বরং বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় করবে।

৯। আদালতগুলোর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম ও পরিষেবাগুলো একটি কেন্দ্রীয় স্থানে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হলে আইনজীবী ও বিচারকদের পেশাগত দক্ষতা বিকাশে তা সহায়ক হবে, পাশাপাশি সমাজে ন্যায়বিচারের অভিগম্যতা বাড়বে। একটি বিকেন্দ্রীভূত হাইকোর্ট বিভাগ আইন পেশা-সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং পরিষেবার সাথে জড়িতদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১০। একটি বিকেন্দ্রীভূত হাইকোর্ট বিভাগ বিচারিক কার্যক্রমকে স্থানীয় সরকারের কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে। এটি নিশ্চিত করবে যে, আইনি সিদ্ধান্তসমূহ আঞ্চলিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে আরও ভালোভাবে সংহত হয়। এই সামঞ্জস্যতা শাসনব্যবস্থা ও পরিষেবা প্রদানের সামগ্রিক সমন্বয়কে সুসংহত করবে। এটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য বজায় রাখবে, কেননা বিকেন্দ্রীভূত আদালতগুলো স্থানীয় সরকারের আইন ও কানুনের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করবে।

১১। বিকেন্দ্রীকরণ কোনোভাবেই সুপ্রিম কোর্টের একক চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করবে না, কেননা দুটো ধারণা বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ও ক্রমাধিকারের ভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে। বিকেন্দ্রীকরণ হাইকোর্ট পর্যায়ে প্রবেশগম্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করলেও বিচার বিভাগের একক চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকে, কেননা সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট তার সাংবিধানিক কর্তৃত্ব বজায় রেখে আইন ব্যাখ্যায় দেশজুড়ে একক চরিত্র নিশ্চিত ও তদারকি করতে পারে। যেমন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে হাইকোর্ট কার্যকর থাকলেও সুপ্রিম কোর্টের কাছে রয়েছে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। এটি নিশ্চিত করে যে, দেশজুড়ে হাইকোর্টের বিচার বিভাগীর সিদ্ধান্তসমূহ ন্যায়বিচার ও জাতীয় আইনের বৃহত্তর নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে। চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতেও বিকেন্দ্রীভূত উচ্চ আদালত রয়েছে, যা একই সাথে কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জনগণের প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম।

বিচার বিভাগের বিচারক নিয়োগ:

১২। বিদ্যমান সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতি এবং তার সাথে পরামর্শ মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেছে। (অনুচ্ছেদ ৯৫[১])। যদিও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসরণ রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক নয়, তবু এই রীতি বহু বছর যাবৎ চলমান। তবে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর পর— যেখানে সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন- জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রথা লঙ্ঘিত হয়। তখন রাজনৈতিক বিবেচনায় জ্যেষ্ঠ বিচারকদের ডিঙিয়ে কনিষ্ঠ বিচারকদের পদোন্নতি দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

১৩। সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রায়ই ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর খেয়ালখুশি ও পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে দেখা যায়। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মতো হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারককে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেওয়ার রীতি ছিল। ক্ষমতাসীনরা ভীষণভাবে এই রীতি লঙ্ঘন করেছে। যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ১০টি ক্ষেত্রে এই রীতি লঙ্ঘন করেছে।[২]

সুপারিশসমূহ

১৪। কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন [জুডিশিয়াল অ্যাপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)] গঠনের সুপারিশ করছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে তারা হচ্ছেন:

১. প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান)
২. আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)
৩. হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য)
৪. অ্যাটর্নি জেনারেল
৫. একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)

১৫। জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন (জেএসসি)-তে একজন নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব কমিশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র তুলে ধরবে।

[২] M Eshteshamul Bari, *The Independence of the Judiciary in Bangladesh Exploring the Gap Between Theory and Practice* (Springer 2022) 165

১৬। জেএসসি সততা, নিষ্ঠা, মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান, পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্যে যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে যাদেরকে রাষ্ট্রপতি বিচারক হিসেবে নিয়োগ করবেন।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

১৭। লর্ড ডেনিং অভিমত দিয়েছিলেন, 'বিচারকদের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কেন্দ্রে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগপ্রক্রিয়া, যা সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার ভাগ্য নির্ধারণ করে। বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ বিচার বিভাগের সততাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা স্বাধীন বিচার বিভাগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর যাবৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ক্ষমতাসীন দলগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে বিচারকদের মান, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতায় স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে, যা তাদের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলস্বরূপ বিচারকদের পেশাদারিত্ব, নৈতিক মানদণ্ড এবং বিচার বিভাগীয় মানদণ্ডের প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হয়েছে।

১৮। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হিসেবে বিচার বিভাগকে সংবিধান এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষাকারী ভূমিকা পালনের জন্য রাজনৈতিক চাপ ও বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। একটি বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (বিনিক)/(JAC) বিচারকদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সততা নিশ্চিত করবে। এটি পছন্দসই লোকের নিয়োগ, স্বেচ্ছাচারিতা অথবা নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের মতো কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। বিনিক/JAC নিশ্চিত করবে যে, বিচারকদের নিয়োগ হয়েছে যোগ্যতা, সততা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে এবং এর বাইরে কোনো প্রভাবের কারণে নয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এসপি গুপ্তা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৮১)[৩] মামলার ঐতিহাসিক রায়ে বলেন যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

১৯। বিচার বিভাগ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস থেকে তার কর্তৃত্ব অর্জন করে। নিয়োগে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বিচার বিভাগের সততা এবং এর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। একটি বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (JAC) নাগরিকদের কাছে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা, ন্যায্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত করবে যে, কেবল যোগ্য ব্যক্তি সর্বোচ্চ আদালতে পদোন্নতি পাবেন। দি কাউন্সিল অব ইউরোপ–এর ভেনিস কমিশন জোর দিয়ে বলেছে যে, জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা বিচার বিভাগীয় পরিষদের মতো স্বাধীন সংস্থা বিচার বিভাগীয় নিয়োগের সুরক্ষা দেয়, পাশাপাশি রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে প্রতিরোধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার মতো দেশগুলো স্বাধীন সংস্থা তৈরি করেছে, যেখানে বিচারক, আইন বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের সদস্যরা বিচারকদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

২০। বিনিক/JAC-এ নাগরিকদের (সাধারণ) উপস্থিতি অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রের প্রতীক হিসেবে কাজ করবে এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক প্রার্থীদের নির্বাচন করতে আইন পেশাজীবী ও সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতার একটি সুষম ভারসাম্য নিশ্চিত করবে। এটি বিচারক নিয়োগে জবাবদিহিও নিশ্চিত করবে। সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ মানে হচ্ছে বিচারক নিয়োগে আইন পেশার সাথে যুক্ত নন এমন কারও অন্তর্ভুক্তি। এটাকে বিচারক নিয়োগপ্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণ করার একটি উপায় হিসেবে দেখা হয়।

২১। বিচারক নিয়োগে নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু একটি চর্চা। এটি বিচার বিভাগের বৈচিত্র্য ও জবাবদিহি বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের আস্থা সংহত করে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জার্মানির মতো দেশগুলোর বিচারক নিয়োগ সংস্থাগুলোর মধ্যে নাগরিক প্রতিনিধিরা বিচারপতি প্রার্থীদের মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে।

২২। বিচারব্যবস্থায় প্রায়ই জনগণের বৈচিত্র্য প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয় না। বিচারক নিয়োগে নাগরিক প্রতিনিধিত্ব এই অসমতার সমাধান করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ প্রতিনিধিত্বহীন দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে বিবেচনায় নেওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হয়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সাধারণ সদস্যগণ এমন বিচারক নিয়োগে অবদান রাখেন, যারা দেশের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বৈষম্যকে বিবেচনায় নিতে সক্ষম হবেন।

২৩। আইন পেশাজীবীরা মূলত প্রায়োগিক/টেকনিক্যাল দক্ষতার ভিত্তিতে প্রার্থী মূল্যায়ন করতে পারেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একজন ভালো বিচারকের একমাত্র মানদণ্ড নয়। সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধিরা আরও কিছু মানদণ্ড যুক্ত করেন, যেমন বিচারকের নৈতিক বিচার, সামাজিক সহানুভূতি এবং সততা। এই গুণাবলি বিচার বিভাগের জন্য অপরিহার্য, কেননা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তসমূহ সমাজে গভীর প্রভাব ফেলবে। সাধারণ নাগরিকদের মতামত নিশ্চিত করবে যে, বিচারক প্রার্থীরা কেবল তাদের আইনি প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই মূল্যায়িত হচ্ছেন না, বরং সামাজিক সমস্যাসমূহ অনুধাবন এবং মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতাও আমলে নেওয়া হয়েছে।

[৩] AIR SC (1982) 149.

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা:

২৪। বর্তমান সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতার বর্তমান মানদণ্ড প্রধানত মেয়াদভিত্তিক। এই মানদণ্ডে গুণগত দক্ষতা অনুল্লেখিত, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচারকার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন পেশাজীবীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে কমিশন সুপারিশ করছে যে -

যে কোনো একজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন যদি তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; এবং

(ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট থাকেন; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালন করেন; অথবা

(গ) বাংলাদেশের যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন; এবং

(ঘ) সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোনো অযোগ্যতা না থেকে থাকলে।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

২৫। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে পেশাদারি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা ব্যতিরেকে কেবল মেয়াদকালকে সাংবিধানিক আবশ্যকতা হিসেবে নির্ধারণ অনুপযুক্ত বিচারিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগকে প্রশস্ত করেছে। আইন বিভাগের অধ্যাপকদের অন্তর্ভুক্তির কারণ হচ্ছে এর ফলে আইনের তত্ত্বীয়, গবেষণা ও বিশ্লেষণকেও অন্তর্ভুক্তি করা সম্ভব হবে। তারা প্রায়ই বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইনের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত থাকেন, যা কোনো জটিল সাংবিধানিক অথবা আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনি বিধিবিধানের গভীর বোঝাপড়ার সাথে গবেষণামূলক পদ্ধতির মিশেলে একজন অধ্যাপক যুক্তিযুক্ত ও প্রগতিশীল রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। যেমন জার্মানির মতো দেশগুলোতে সাংবিধানিক আদালত প্রায়ই একাডেমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কারণ, এর মাধ্যমে বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহে কেবল প্রায়োগিক দিকের প্রতিফলন ঘটে না, বরং বিকাশমান আইনশাস্ত্রের প্রবণতাসমূহেরও প্রতিফলন থাকে। অনুরূপভাবে কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আইনি বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক আইনের বিচারিক চিন্তাভাবনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

২৬। সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগসমূহে যদি কেবল প্রচলিত চাকরি করা বিচারক বা জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে এটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তিদের বাদ দিতে পারে। এগুলো সামগ্রিক বিচার বিভাগের জন্য অপরিহার্য। প্রশ্নাতীত সততা এবং দক্ষতার অধিকারী আইনবিশারদ/আইন বিভাগের একাডেমিকদের নিয়োগ নিশ্চিত করে যে, বেঞ্চ মানবাধিকার, পাবলিক পলিসি ও আন্তর্জাতিক আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত সন্নিবেশিত করতে পারবে। ভারতের বিচারব্যবস্থা বিদ্যায়তনিক জগৎ ও কর্মবিভাগের বিভিন্ন পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে এবং সমাজের বিচিত্র সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৭। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিচার বিভাগ সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ এবং নৈতিক আচরণের প্রতিনিধিত্ব করবে। কেননা বিচার বিভাগ সমাজে ন্যায় ও সুবিচারের এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। প্রমাণিত সততা এবং সৎ ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করবে যে, বিচার বিভাগ তার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখছে। যেখানে দুর্নীতি বা রাজনৈতিক প্রভাব ঐতিহাসিকভাবে বিচারিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেখানে এই বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক আদালত তার সততার জন্য সুপরিচিত। কারণ, সেখানে প্রচলিত যোগ্যতার পাশাপাশি বিচারকরা চরিত্র, নৈতিক মান এবং জনগণের সেবায় তাদের অবদানের গভীর মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে, বিচার বিভাগ দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সুবিচার, উদ্ভাবন ও ন্যায্যতার রক্ষক হিসেবে থাকে।

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:

২৮। বর্তমান সংবিধান অনুসারে, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি (অনুচ্ছেদ ৯৫)। তবে এই প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা বা মেধার ভিত্তির বিপরীতে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং আনুগত্যের বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সুপারিশ

২৯। কমিশন আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করছে। এটি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের স্বার্থে কনিষ্ঠ বিচারক কর্তৃক উপেক্ষার মাধ্যমে প্রধান বিচারপতির নিয়োগে নির্বাহী/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রোধ করবে।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

৩০। সাংবিধানিক গণতন্ত্রে, যেখানে বিচার বিভাগ হচ্ছে সংবিধানের অভিভাবক এবং ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা, সেখানে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়াতে অবশ্যই ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের রীতি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সততার একটি মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

৩১। জ্যেষ্ঠতার নীতি মেধা বা ব্যক্তিগত পছন্দের মতো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, বরং একটি নির্মোহ মানদণ্ডের ওপর নির্ভরশীল, সেটি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে কাজের মেয়াদ। একজন জ্যেষ্ঠ বিচারক দশকের পর দশক সাংবিধানিক ও আইনি সমস্যার ফায়সালা দেওয়ার কারণে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জ্যেষ্ঠতার নীতি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ হ্রাস করে, কেননা এটি বিচারকদের ধারাবাহিক কাজ এবং বিচারিক মনোভাব প্রদর্শনের কারণে পদোন্নতি নিশ্চিত করে।

৩২। জ্যেষ্ঠতম বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার রীতি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এটি প্রধান বিচারপতির নিয়োগে রাজনৈতিক বা নির্বাহী এখতিয়ার ব্যবহার করার কোনো সুযোগ তৈরি হতে দেয় না। এই নীতি বিভিন্ন দেশের বিচারব্যবস্থায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতে দ্বিতীয় বিচারপতি মামলা (১৯৯৩)[৪] এবং পরবর্তী রায়গুলোতে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বিচারিক প্রাধান্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠতার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে বিচার বিভাগ নিজেদের নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে। আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্য দেশগুলো রাজনৈতিক নিয়োগের বিপদগুলো স্বীকার করে জ্যেষ্ঠতা বা নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারিক নেতৃত্ব নিয়োগের রীতি অনুসরণ করেছে।

৩৩। জ্যেষ্ঠতম বিচারক ইতিমধ্যে আদালতের কার্যপ্রণালি, প্রটোকল এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। প্রধান বিচারপতি কেবল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান নন; তিনি বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেমন মামলার বরাদ্দ, বেঞ্চ গঠন এবং নিম্ন আদালতগুলো তদারকি করা তার কাজের আওতায় পড়ে। মেধার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উন্নীত বিচারক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেন।

৩৪। জ্যেষ্ঠতার নীতি বিচারকদের মধ্যে ন্যায়বোধ, পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক বিচারক জানেন যে প্রধান বিচারপতির পদে তাদের উত্তরণ একটি নিরপেক্ষ নীতির ওপর নির্ভরশীল, কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা নির্বাহী হস্তক্ষেপের ওপর নয়। এটি বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হ্রাস করে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ:

৩৫। ২০২৪ সালের অক্টোবরে[৫] সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের (SJC) ক্ষমতা পুনর্বহাল করে। এই কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা বা পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত ও সমাধান করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। যদি তারা কোনো বিচারককে দোষী সাব্যস্ত করে, তবে সেই বিচারকের অপসারণের জন্য বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়।

সুপারিশ:

৩৬। কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের পেশাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি (বর্তমানে যেমন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে) বহাল রাখার সুপারিশ করছে।

তবে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি)-এর থাকবে।

---

[৪] AIR SC (1994) 268.

[৫] Bangladesh and others v Advocate Asaduzzaman Siddiqui and others (Civil Review Petition No 751 of 2017, AD, 20 October 2024); Tribune Desk, '16th amendment hearing: Power to remove judges returns to Supreme Judicial Council' Dhaka Tribune (Dhaka, 20 October 2024) < https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/362480/16th-amendment-hearing-power-to-remove-judges> accessed 12 December 2024.

সে মর্মে, এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, যদি রাষ্ট্রপতি বা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (এনসিসি) বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, একজন বিচারক নিম্নোক্ত কারণে –

(ক) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার দরুন স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হতে পারেন,

তাহলে রাষ্ট্রপতি অথবা এনসিসি (যা প্রযোজ্য) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে বিষয়টি তদন্ত করে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাতে নির্দেশ দেবেন।

উপরোক্ত তদন্ত নিম্নোক্ত তিনভাবে সূচনা করা যাবে

(ক) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন চাইতে পারবে;

(খ) রাষ্ট্রপতি অন্য যে কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের জন্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবেন;

(গ) এনসিসি তদন্তের জন্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে পাঠাতে পারবে;

সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির কাছে কারো বিষয়ে তদন্তের অনুমতি চায় অথবা রাষ্ট্রপতি যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে তদন্তের নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিষয়টি এনসিসি-কে অবহিত করবে।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অভিযোগ তদন্তের ফলাফল রাষ্ট্রপতি এবং এনসিসি -কে অবহিত করবে।

যদি তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল মতামত দেয় যে, বিচারক স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী, তাহলে রাষ্ট্রপতি আদেশবলে বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।

৩৭। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠতম বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

৩৮। যেখানে বিচারকদের অপসারণ কেবল নির্বাহী বিভাগ বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন আইনসভা দ্বারা অভিশংসনের মাধ্যমে সম্ভব হয়, সেখানে রাজনীতিকরণের উচ্চ ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে এবং পক্ষপাতদুষ্ট বা অন্যায্য ফলাফলের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

৩৯। জ্যেষ্ঠ বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (SJC) বিচারকদের অসদাচরণ মূল্যায়নে একটি নিরপেক্ষ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারিক অসদাচরণকে মূল্যায়ন করবে। কমিশন জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলকে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিচ্ছে, কেননা এর মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব যে, রাষ্ট্রপতি কোনো অসদাচরণের অভিযোগ রাজনৈতিক বিবেচনায় উপেক্ষা করতে পারবেন না।

৪০। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের একটি স্বাধীন তদারকি সংস্থার কাছে জবাবদিহি করার মাধ্যমে এসজেসি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করে। এটি বিচার বিভাগের মধ্যকার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও সাংবিধানিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। এর ফলে গণতন্ত্রের স্তম্ভ হিসেবে আইনের শাসনকে আরও শক্তিশালী করবে।

৪১। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে শুরু করে নৈতিক মান লঙ্ঘন পর্যন্ত সকল বিচার বিভাগীয় অসদাচরণ যথাযথভাবে সমাধান না করা হলে বিচারের অপরিণত রায় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (SJC) তার কাঠামো এবং ম্যান্ডেটের মাধ্যমে এ ধরনের অসদাচরণের তদন্ত ও সমাধানের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক, স্বাধীন এবং ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এসজেসি অক্ষমতা বা অসদাচরণের অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও নিরপেক্ষ কাঠামো প্রদান করবে, যা স্বেচ্ছাচারী অপসারণ রোধ করার পাশাপাশি জবাবদিহিও বজায় রাখবে। এই ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একদিকে ভারসাম্যহীন বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা জবাবদিহির অভাব তৈরি করতে পারে, অন্যদিকে অতিরিক্ত তদারকি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকি তৈরি করবে।

৪২। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ব্যবস্থা বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার নীতি এবং জবাবদিহির প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। বিচার বিভাগ যে ন্যায়বিচার পাওয়ার নির্ভরযোগ্য এবং নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ হিসেবে বহাল থাকতে পারে, সেটা নিশ্চিত হয় এর

মাধ্যমে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় Judicial Service Commission বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করে। কীভাবে একটি কাঠামোবদ্ধ তদারকি বিচার বিভাগীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে, পাশাপাশি যথাযথ প্রক্রিয়ার সম্মান বজায় রাখতে পারে, তা বোঝা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার কমিশনের নজির থেকে। পাকিস্তানে এসজেসি মডেলও দুর্নীতি বা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত বিচারকদের অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং মালয়েশিয়া থেকে একই রকম উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

'অধস্তন' আদালত:

৪৩। 'অধস্তন আদালত' শব্দটি সাধারণত বিচার বিভাগীয় ক্রমাধিকারে, বিশেষত যেখানে বহুস্তরীয় আইনি ব্যবস্থ বিদ্যমান, নিম্ন আদালতগুলোকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে যদিও এই শব্দটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, তবে এর কিছু সমস্যামূলক ধারণাগত ইঙ্গিত রয়েছে এবং এগুলো ভাষাতাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার যোগ্য।

সুপারিশ

৪৪। কমিশন 'অধস্তন আদালত'–এর পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহারের প্রস্তাব করছে। 'অধস্তন আদালত' অভিব্যক্তি আদালতসমূহের মর্যাদা এবং মূল্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

৪৫। কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে কমিশন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকবে।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

৪৬। 'অধস্তন' অথবা 'Subordinate' শব্দটি স্বভাবতই হীনম্মন্যতা ও অধীনতার ধারণা/বোধ বহন করে। এটি হাইকোর্ট বিভাগের নিচে থাকা আদালতগুলোর বিষয়ে বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। 'নিম্ন আদালত' সাধারণত 'অধস্তন আদালত' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটিও একইভাবে ক্রমাধিকারতান্ত্রিক হলেও এটি তুলনামূলকভাবে কম অবমূল্যায়নকর এবং অধীনতার পরিবর্তে শ্রেণিবিন্যাসের একটা স্তরকে নির্দেশ করে। তথাকথিত নিম্ন আদালত বিচারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি বিপুলসংখ্যক বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং নাগরিকদের সাথে বিচার বিভাগের প্রাথমিক সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে। এগুলোকে 'অধস্তন' বলে সম্বোধন করার ফলে এগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদায় আঘাত লাগার ঝুঁকি তৈরি হয়। অধস্তন শব্দটি অসাবধানতাবশত এই ধারণাটিকে স্থায়ী করতে পারে যে নিম্ন আদালতগুলো কম দক্ষ বা কম কর্তৃত্বপূর্ণ। এর ফলে এগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পাবে। বাস্তবে গুণগত বা কার্যকরতার জায়গা থেকে এই আদালতগুলো অধস্তন নয়, বরং একটি কাঠামোগত শ্রেণিবিন্যাস বা ক্রমাধিকারতন্ত্রের মধ্যে একে কাজ করতে হয়।

৪৭। 'অধস্তন' শব্দটি নিম্ন আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। আদালতের শ্রেণিবিন্যাস একটি আপিল এবং বিচারিক পর্যালোচনার ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। এ কারণে নিম্ন আদালতগুলো সুপ্রিম কোর্টের 'অধীন' নয়, বরং এটি একটি সহযোগিতামূলক বিচারিক কাঠামোর অংশ, যা আইনে সামঞ্জস্যতা, ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই আদালতসমূহের বিচারকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন; তারা কেবল আইন ও পূর্ববর্তী নজির দ্বারা আবদ্ধ। তাদের 'অধস্তন' হিসেবে অভিহিত করার ফলে তাদের বিচারিক স্বায়ত্তশাসনের অনুভূতিকে ক্ষুণ্ন করা হয়।

৪৮। আধুনিক আইনব্যবস্থা সকল বিচারিক প্রতিষ্ঠানের সমতা, মর্যাদা এবং শ্রদ্ধাকে গুরুত্ব দেয়। 'অধস্তন' শব্দটি অকেজো এবং ক্রমাধিকারতান্ত্রিক বলে মনে হয়, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক দেশে এই আদালতগুলোকে 'প্রথম পর্যায়ের আদালত' (যেমন, ইউরোপে) বা 'trial courts' (যুক্তরাষ্ট্রে) নামে সম্বোধন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিচারিক ক্রমাধিকারতন্ত্রে তাদের অবস্থানের বিপরীতে তাদের কার্যক্রমকে তুলে ধরে।

৪৯। 'স্থানীয় আদালত' শব্দ ক্রমাধিকারতন্ত্রের বিপরীতে বিচারিক সীমারেখা ইঙ্গিত করে। এই শব্দে তাদের কার্যকলাপ ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা রক্ষিত হয় এবং তথাকথিত নিম্ন আদালতের ওপর জনগণের আস্থাও বৃদ্ধি পায়। আইনি ডিসকোর্সের বিকাশ এবং সমতা, মর্যাদা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করার এখনই মোক্ষম সময়।

বিচারিক সচিবালয়

৫০। বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৬ অনুযায়ী, 'নিম্ন আদালত' বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির পরামর্শ মোতাবেক রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত রয়েছে। বাস্তবে সরকারের নির্বাহী বিভাগ এই প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে থাকে।

সুপারিশ

৫১। কমিশন সুপারিশ করছে যে, স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এই উদ্দেশ্যে কমিশন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছে।

৫২। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়নে বিচারিক সচিবালয়, স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে থাকবে। এর মাধ্যমে বিচার বিভাগ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

৫৩। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়টি রাজনৈতিক বুলিতে "ভদ্র স্বীকৃতি" পেয়েছে, তবে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে এর পৃথকীকরণ প্রধান রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মূল এজেন্ডা বলে বিবেচিত হয়নি'।[৬] স্থানীয় আদালতগুলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মৌলিক ভিত্তি, কেননা এগুলো সাধারণ নাগরিকদের জন্য বিচারব্যবস্থায় অভিগম্যতার সূচনাবিন্দু। অল ইন্ডিয়া জাজেস অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (১৯৯২)[৭] মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মতামত অনুযায়ী, ন্যায্যতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব স্তরের বিচারকদের স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে। স্থানীয় আদালতের কার্যক্রমে কোনো পক্ষপাতিত্ব, অদক্ষতা বা বহিরাগত হস্তক্ষেপের ধারণা জনগণের বিশ্বাসকে নষ্ট করে ফেলবে।

৫৪। পদায়ন, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলার জন্য একটি কেন্দ্রীভূত এবং স্বাধীন ব্যবস্থা না থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব বা অকার্যকারিতার জন্ম দিতে পারে। যদিও স্থানীয় আদালতের বিচারকরা সাংবিধানিক ম্যান্ডেট মেনে চলেন, তবু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কারণে প্রায়ই নির্বাহী ক্ষমতার প্রভাবের শিকার হতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয়ের অধীনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রাখলে নির্বাহী হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকবে না, যা সব স্তরের বিচারিক স্বাধীনতাকে সুসংহত করবে।

৫৫। এই সচিবালয় শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সমাধান করবে, যা আদালতের প্রতি জনগণের আস্থাকে সুরক্ষিত রাখবে। সুপ্রিম কোর্ট শৃঙ্খলাসংক্রান্ত প্রক্রিয়া তদারকি করার ফলে বিচারকদের সরকারের অন্যান্য বিভাগের হস্তক্ষেপ বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে না। এই যুক্তি ভারতের সেকেন্ড জাজেস মামলা (১৯৯৩) থেকে আরও স্পষ্ট হয়, যেখানে নিজেদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিচার বিভাগের প্রাধান্যের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছিল। এটি নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ তদারকির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল।

৫৬। উত্তর ইউরোপীয় মডেলের অধীনে, সুইডেন এবং ডেনমার্কে কাউন্সিলগুলোর নিয়োগ এবং শৃঙ্খলামূলক বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদানের মতো প্রাথমিক কাজ ছাড়াও প্রশাসন (যেমন বিচারিক রেজিস্ট্রি অফিসের তদারকি, কেসলোড এবং কেস স্টক, প্রবাহের হার, আইনগত একরূপতা, মানসম্পন্ন সেবা ইত্যাদি) এবং আদালত ব্যবস্থাপনা (যেমন বাসস্থান, অটোমেশন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অনেক দূরপ্রসারী ক্ষমতা রয়েছে। তদুপরি তারা আদালতের বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (বাজেট নির্ধারণে অংশগ্রহণ, বিতরণ এবং বরাদ্দ, ব্যয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)।

৫৭। বিচারিক প্রশাসনের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় আদালতের প্রশাসনে প্রায়ই বিলম্ব, অদক্ষতা এবং অসঙ্গতি তৈরি করে। একটি বিচারিক সচিবালয় এই কার্যক্রমগুলোকে সহজতর করে তুলবে। সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি স্বাধীন সচিবালয় জনগণের আস্থা বাড়াবে যে বিচারিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলা কেবল যোগ্যতা এবং সততার ভিত্তিতে করা হচ্ছে।

---

[৬] Malik, Shahdeen, "Laws of Bangladesh", in Chowdhury, A.M. and Alam, Fakhrul (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty-First Century*, Asiatic Society of Bangladesh, 2002, pp. 433-480, p. 438.

[৭] AIR SC (1992) 165.

বিচার বিভাগের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন

৫৮। নির্বাহী বিভাগের ওপর বিচার বিভাগের ধারাবাহিক আর্থিক নির্ভরশীলতা তার আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করে। বাজেট পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগ এ বিষয়ে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি।

সুপারিশ

৫৯। কমিশন বিচার বিভাগকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের সুপারিশ করছে এবং সমস্ত কার্যকরী, লজিস্টিক এবং প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহনের জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে সরাসরি অর্থায়ন নিশ্চিত করার সুপারিশ করছে।

সুপারিশের যৌক্তিকতা

৬০। বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি বিচার বিভাগ সংবিধান রক্ষা, আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং মৌলিক অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই দায়িত্বগুলো কার্যকরভাবে পালনের জন্য বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে হবে—এটি কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, বরং তার আর্থিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও। আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে যে বিচার বিভাগ নির্বাহী বা আইনসভা দ্বারা অযাচিতভাবে প্রভাবিত না হয়ে তার সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবে।

৬১। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিচারিক কাঠামো থেকে দেখা যায় যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিচারব্যবস্থায় জনগণের আস্থা রক্ষার জন্য পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। The Bangalore Principles of Judicial Conduct (২০০২) জোর দিয়ে বলে যে, আর্থিক স্বাধীনতা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের ওপর নির্ভরশীল থাকলে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। The Commonwealth Latimer House Principles (২০০৩) একইভাবে বলে যে, বিচার বিভাগের অবশ্যই 'কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য যথাযথ ও টেকসই তহবিল থাকা উচিত'। অন্যথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি অলীক স্বপ্নই থেকে যাবে।

৬২। নির্বাহী বিভাগের ওপর আর্থিক নির্ভরশীলতা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতাকে বিনষ্ট করতে পারে। এটি কেবল অনুমান নয়, বরং বাস্তবেও এটা ঘটে থাকে। অর্থ বরাদ্দ এবং তহবিল আটকে রাখার ক্ষমতা বিচার বিভাগের ওপর সূক্ষ্ম চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, আদালতের পরিকাঠামো, বিচারকদের বেতন বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যেমন প্রযুক্তি এবং আইনি গবেষণা সরঞ্জামের জন্য অপ্রতুল তহবিল বিচার কার্যক্রম, দক্ষতা এবং মনোবলকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পরিকল্পনা, বরাদ্দ এবং প্রশাসনের ওপর বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কানাডার মতো দেশগুলোতে বিচার বিভাগ তাদের বাজেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করে। এর ফলে তারা প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার অনুযায়ী সংস্কার পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিচার বিভাগ তাদের বাজেট তৈরি করে, যা অনুমোদনের জন্য সরাসরি কংগ্রেসে জমা দেওয়া হয়। বিচার বিভাগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে নির্বাহী বিভাগের কোনো ভূমিকা নেই।

৬৩। পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা বিচার বিভাগকে তার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ করতে সক্ষম করে তোলে, যার মাধ্যমে কাঠামোগত অদক্ষতা দূর করা যায়। অনেক আদালত, বিশেষত স্থানীয় আদালত দুর্বল অবকাঠামো, পুরোনো প্রযুক্তি এবং পর্যাপ্ত সুবিধার অভাবে জর্জরিত। একটি আর্থিকভাবে স্বাধীন বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করে এই চাহিদাগুলো মেটাতে সক্ষম হবে। বিচার বিভাগের আর্থিক নিয়ন্ত্রণে থাকলে তা বিচারকদের এবং আদালত কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনি গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

৬৪। যেহেতু আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা বিচারকদের বহিরাগত প্রভাবের মুখে ফেলতে পারে, সেহেতু বিচারকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ এই স্বাধীনতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিচারকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তবে তা সূক্ষ্ম চাপের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিকভাবে স্বাধীন বিচার বিভাগ নিশ্চিত করে যে বিচারকরা তাদের মর্যাদা ও স্বাধীনতার সুরক্ষা দেয় এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পান। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট All India Judges Association v. Union of India (১৯৯২) মামলায় উল্লেখ করেছে যে, বিচারকদের বেতন-ভাতায় অবশ্যই সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিফলিত হতে হবে, যা নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত।

৬৫। বিশ্বজুড়ে সাংবিধানিক আদালতগুলো স্বীকৃতি দিয়েছে যে, বিচার বিভাগের সততা রক্ষা এবং বিচারকদের রাজনৈতিক বা আর্থিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আর্থিক স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত জরুরি। অনেক আধুনিক সংবিধানে স্পষ্টভাবে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিচার বিভাগের বাজেট এমনভাবে সরবরাহ করতে হবে, যাতে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়।

প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বিদ্যমান সংবিধানের যে বিধানগুলো সংস্কার করতে হবে:

প্রাসঙ্গিক প্যারা	সংস্কার প্রস্তাব	বিদ্যমান সংবিধানের সংশোধনযোগ্য বিধানসমূহ
৩	হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ	অনুচ্ছেদ ৯৪, ১০০, ১০২, ১০৭, ১০৯, ১১০
৪	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ	অনুচ্ছেদ ৯৫, ৯৬, ৯৮
৭	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের যোগ্যতা	অনুচ্ছেদ ৯৫
৮	প্রধান বিচারপতির নিয়োগ	অনুচ্ছেদ ৯৫
৯	সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ	অনুচ্ছেদ ৯৬
১১	অধস্তন আদালতের নাম পরিবর্তন	অধ্যায়ের শিরোনাম; ষষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ-এ "অধস্তন আদালত"; অনুচ্ছেদ ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬
১২	বিচারিক সচিবালয়ের প্রতিষ্ঠা	অনুচ্ছেদ ৮৮, ১১৫, ১১৬

সাংবিধানিক কমিশনসমূহ

সংবিধান সংশোধন কমিশন (Constitution Reform Commission- CRC) পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন সুপারিশ করছে। অন্য অনেক বিদ্যমান কমিশন রয়েছে, যেমন: তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আইন কমিশন, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন। তবে সিআরসি মনে করে যে এই পর্যায়ে উক্ত কমিশনগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক নয়।

সংবিধানে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত বিধান কোনো পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং "নির্বাচন" শিরোনামে সপ্তম ভাগে তিনটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্পর্কিত বিধানও কোনো পৃথক অংশে অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং "সরকারি কর্ম কমিশন" শিরোনামে নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু সাংবিধানিক কমিশনগুলোর জন্য একটি পৃথক অংশ সুপারিশ করা হচ্ছে, সেহেতু নির্বাচন কমিশন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিধানগুলো সাংবিধানিক কমিশনের অংশে অন্তর্ভুক্ত করাই হবে যুক্তিসঙ্গত।

সিআরসি (CRC) কর্তৃক সুপারিশকৃত পাঁচটি কমিশনের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান চারটি কমিশনের গঠন, মেয়াদকাল, অপসারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ:

- নির্বাচন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে গঠিত; পাবলিক সার্ভিস কমিশন একজন চেয়ারম্যান এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত; দুর্নীতি দমন কমিশন তিনজন কমিশনার নিয়ে গঠিত, যাঁদের একজন চেয়ারম্যান; এবং মানবাধিকার কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত।[১]
- মেয়াদের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনারগণ পাঁচ বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন; পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ পাঁচ বছর মেয়াদ বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন; দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনারবৃন্দ পাঁচ বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন; এবং মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ তিন বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।
- নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানগুলোতে বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোনো উল্লেখ নেই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে, সংবিধানে বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত একটি বিধান রয়েছে। সাংবিধানিক কমিশনগুলোর জন্য একটি পৃথক ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হলে, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিধানগুলো সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সিআরসি (CRC)'র সুপারিশমালার লক্ষ্য হচ্ছে সকল কমিশনের গঠন, নিয়োগ, মেয়াদ ও অপসারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমরূপতা নিশ্চিত করা।

[১] The existing law provides that among the Members at least one shall be a woman and one shall be from the ethnic groups (section 5(3) of the National Human Rights Commission Act 2009).

বিবিধ

নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি

কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি'র সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন, যাতে অভ্যন্তরীণ জলভাগ, রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা, সন্নিহিত অঞ্চল, মহীসোপান ও সম্প্রসারিত মহীসোপান, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EEZ), এবং গভীর সমুদ্রে প্রযোজ্য অধিকারসহ সামুদ্রিক অঞ্চলের সকল সম্পদ অন্তর্ভুক্ত হয়।

'নাগরিকতন্ত্রের সম্পত্তি'র সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে সমুদ্রের তলদেশে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা হলে সম্পদ আহরণ, অনুসন্ধান ও ব্যবহার করার জন্য একটি বিস্তৃত পরিসর সৃষ্টি হবে। সকল প্রাকৃতিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সরকার উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে পারবে, যা জীববৈচিত্র্য রক্ষা করবে। তদুপরি একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞা প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবে, যা এ দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে।

চুক্তি

কমিশন সুপারিশ করছে যে, সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিল যা কোনো দেশ/সংস্থা/করপোরেশনের সঙ্গে সম্পাদিত হয়, তা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়বস্তু নিয়ে চুক্তি/চুক্তিপত্র/দলিলের ক্ষেত্রে সংসদের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন।

জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনসভায় উন্মুক্ত আলোচনা এবং নজরদারি ব্যবস্থা একটি বিশেষ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি করার ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অনেক ঘটনা ঘটেছে। যা অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এইসব চুক্তির ফলে সরকারের ওপর বিরূপ আর্থিক প্রভাব পড়েছে, যা জাতীয় স্বার্থকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিগত সরকারের আমলে সম্পাদিত বেশ কিছু বিতর্কিত চুক্তি, যথা - রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গড্ডা (আদানি) বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মত জনস্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদন থেকে নিবৃত্ত করা যেত।

সংজ্ঞা

কমিশন 'রাষ্ট্র'-এর সংজ্ঞায় 'বিচার বিভাগ' অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে। নির্বাহী বিভাগ এবং আইন বিভাগের পাশাপাশি বিচার বিভাগ হলো রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি। রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ক্ষমতার বিভাজনের মূলনীতি সমুন্নত হবে। তাছাড়া সাংবিধানিক অধিকারের সুরক্ষা ও বাস্তবায়নের জন্য বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিচার বিভাগ যে রাষ্ট্রকাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা এরূপ সংশোধিত সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হবে।

সুতরাং কমিশন সুপারিশ করছে যে, 'আইন বিভাগ, সরকার এবং আইনানুগ সরকারি কর্তৃপক্ষ'-এর পরিবর্তে 'রাষ্ট্র' শব্দের সংজ্ঞায় 'আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ' অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

পরিশিষ্ট ১

প্রজ্ঞাপন—১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৭, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করিয়া সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে "সংবিধান সংস্কার কমিশন" নামে নিম্নরূপ কমিশন গঠন করিল:

(ক) **সংবিধান সংস্কার কমিশন**

১. অধ্যাপক আলী রীয়াজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক	-কমিশন প্রধান
২. জনাব সুমাইয়া খায়ের, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৩. জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	- সদস্য
৪. জনাব মুহাম্মদ ইকরামুল হক, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৫. ড. শরীফ ভূঁইয়া, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট	- সদস্য
৬. জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	- সদস্য
৭. জনাব ফিরোজ আহমেদ, লেখক	- সদস্য
৮. জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী	- সদস্য
৯. জনাব মোঃ মাহফুজ আলম, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	- সদস্য

(খ) কমিশন ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তর করিবে;

(গ) কমিশনের কার্যালয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(ঘ) কমিশনের প্রধান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সরকারি পদমর্যাদা, বেতন/সম্মানি ও সুযোগ-সুবিধা পাইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রধান বা কোনো সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কমিশনের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহসহ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(চ) কমিশন প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(ছ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট ২

প্রজ্ঞাপন—২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৯, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ আশ্বিন, ১৪৩১/০৯ অক্টোবর, ২০২৪

এস.আর.ও. নম্বর ৩৪১-আইন/২০২৪।—সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে গত ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গঠিত নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এবং ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন-এর কমিশন প্রধানগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির মর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

২। উক্ত কমিশনসমূহের সদস্যগণ যাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত নহেন তাহারা কমিশনের প্রত্যেক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা সম্মানি এবং যাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত তাহারা কমিশনের প্রত্যেক সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা সম্মানি প্রাপ্ত হইবেন।

৩। তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন প্রধান বা কোন সদস্য অবৈতনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে চাহিলে বা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে না চাহিলে তাহা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট ৩

প্রজ্ঞাপন—৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ পৌষ, ১৪৩১/০২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৬-আইন/২০২৫।—সরকার ৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪ দ্বারা গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন-এর মেয়াদ আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আবদুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

পরিশিষ্ট ৪

যে সব দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করা হয়েছে তার তালিকা

১। বাংলাদেশ
২। ভারত
৩। চীন
৪। পাকিস্তান
৫। জাপান
৬। ফিলিপাইন
৭। ভিয়েতনাম
৮। ইরান
৯। তুরস্ক
১০। থাইল্যান্ড
১১। দক্ষিণ কোরিয়া
১২। ইরাক
১৩। আফগানিস্তান
১৪। ইয়েমেন
১৫। উজবেকিস্তান
১৬। মালয়েশিয়া
১৭। সৌদি আরব
১৮। নেপাল
১৯। উত্তর কোরিয়া
২০। সিরিয়া
২১। শ্রীলংকা
২২। কাজাখস্তান
২৩। কম্বোডিয়া
২৪। জর্ডান
২৫। সংযুক্ত আরব আমিরাত
২৬। সিঙ্গাপুর
২৭। ওমান
২৮। কুয়েত
২৯। কাতার
৩০। ভুটান
৩১। অস্ট্রেলিয়া
৩২। নিউজিল্যান্ড
৩৩। রাশিয়া
৩৪। ইন্দোনেশিয়া
৩৫। জার্মানি
৩৬। ইতালি
৩৭। ফ্রান্স
৩৮। স্পেন
৩৯। পোল্যান্ড
৪০। ইউক্রেন
৪১। রোমানিয়া
৪২। নেদারল্যান্ড
৪৩। বেলজিয়াম
৪৪। সুইডেন
৪৫। পর্তুগাল
৪৬। গ্রিস
৪৭। অস্ট্রিয়া
৪৮। বেলারুশ
৪৯। সুইজারল্যান্ড
৫০। বুলগেরিয়া
৫১। সার্বিয়া
৫২। ডেনমার্ক
৫৩। ফিনল্যান্ড
৫৪। নরওয়ে
৫৫। আয়ারল্যান্ড
৫৬। ক্রোয়েশিয়া
৫৭। আলবেনিয়া
৫৮। স্লোভেনিয়া
৫৯। মাল্টা
৬০। আইসল্যান্ড
৬১। হাঙ্গেরি
৬২। লুক্সেমবার্গ
৬৩। যুক্তরাজ্য
৬৪। ব্রাজিল
৬৫। কলাম্বিয়া
৬৬। আর্জেন্টিনা

৬৭। পেরু
৬৮। ভেনিজুয়েলা
৬৯। চিলি
৭০। ইকুয়েডর
৭১। বলিভিয়া
৭২। প্যারাগুয়ে
৭৩। উরুগুয়ে
৭৪। গায়ানা
৭৫। সুরিনাম
৭৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
৭৭। মেক্সিকো
৭৮। কানাডা
৭৯। গুয়েতেমালা
৮০। হাইতি
৮১। ডোমিনিকান রিপাবলিক
৮২। কিউবা
৮৩। এল সালভেদর
৮৪। কোস্টারিকা
৮৫। পানামা
৮৬। পুয়ের্তো রিকো
৮৭। জ্যামাইকা
৮৮। বাহামা
৮৯। বেলিজ
৯০। বার্বাডোস
৯১। সেন্ট লুসিয়া
৯২। গ্রানাডা
৯৩। ডোমিনিকা
৯৪। নাইজেরিয়া
৯৫। ইথিওপিয়া
৯৬। মিশর
৯৭। তানজানিয়া
৯৮। দক্ষিণ আফ্রিকা
৯৮। কেনিয়া
১০০। সুদান
১০১। উগান্ডা
১০২। আলজেরিয়া
১০৩। মরক্কো
১০৪। ঘানা
১০৫। মাদাগাস্কার
১০৬। ক্যামেরুন
১০৭। সেনেগাল
১০৮। জিম্বাবুয়ে
১০৯। লিবিয়া
১১০। কঙ্গো
১১১। নামিবিয়া
১১২। গাম্বিয়া
১১৩। গ্যাবন
১১৪। মরিশাস
১১৫। জিবুতি
১১৬। কমরোস
১১৭। বতসোয়ানা
১১৮। সোমালিয়া
১১৯। বুরুন্ডি
১২০। টোগা
১২১। লেসোথো

পরিশিষ্ট ৫

রাজনৈতিক দলের তালিকা-১

(তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দল)

১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি.
২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৩। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (NDM)
৪। নাগরিক ঐক্য
৫। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
৬। ভাসানী অনুসারী পরিষদ
৭। বাংলাদেশ লেবার পার্টি
৮। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
৯। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
১০। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
১১। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
১২। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (পীর-চরমোনাই)
১৩। জাতীয় গণফ্রন্ট
১৪। গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)
১৫। গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
১৬। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি
১৭। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি
১৮। বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
১৯। গণসংহতি আন্দোলন
২০। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
২১। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
২২। জাতীয় নাগরিক কমিটি
২৩। ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ
২৪। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
২৫। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
২৬। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (জোট)
২৭। বারো দলীয় জোট (জোট)
২৮। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (জোট)

পরিশিষ্ট ৬

রাজনৈতিক দলের তালিকা-২

(তালিকার বাইরে যে সকল রাজনৈতিক দল প্রস্তাব জমা দিয়েছে)

১। বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
২। খেলাফত মজলিস
৩। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৪। জাতীয় পার্টি (জাফর)
৫। প্রগতিশীল গ্রীন পার্টি
৬। ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

পরিশিষ্ট ৭

সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর তালিকা

১। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
২। এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ (এএলআরডি)
৩। বাংলাদেশে জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)
৪। রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার
৫। উইমেন উইথ ডিজএবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৬। ক্যাম্পেইন ফর পপুলার ফাউন্ডেশন
৭। নারীপক্ষ
৮। বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৯। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি
১০। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
১১। চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ
১২। বাঁচতে শেখা
১৩। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১৪। বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট (বিআইএম)
১৫। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)
১৬। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ
১৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
১৮। সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস)
১৯। মায়ের ডাক
২০। দলিত নারী ফোরাম
২১। নাগরিক উদ্যোগ
২২। সম্পূর্ণা
২৩। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
২৪। Dhaka University Law Student Forum
২৫। রাষ্ট্র বিচার সভা
২৬। বালাকোট-চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
২৭। La Voix Dex Jummas
২৮। আল আজহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
২৯। উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
৩০। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
৩১। জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি
৩২। ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
৩৩। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ

৩৪। হাদিছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড
৩৫। English Olympiad
৩৬। Right to Fair Urban Life
৩৬। Centre for Law Governance and Policy (CELGAP)
৩৮। বিয়াম ফাউন্ডেশন
৩৯। বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন
৪০। America Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (ABCCI)
৪১। আদিবাসী মুক্তি মোর্চা
৪২। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট
৪৩। সিরাজুল আলম খান সেন্টার
৪৪। বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
৪৫। বাংলাদেশ প্রফেশনালস
৪৬। CHT Working Group for National Reform
৪৭। তথ্য অধিকার ফোরাম

পরিশিষ্ট ৮

পেশাজীবী সংগঠনগুলোর তালিকা

১। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা)
২। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
৩। ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)
৪। জাতীয় প্রেস ক্লাব
৫। ডক্টরস প্লাটফর্ম ফর পিপলস হেলথ (ডিপিপিএইচ)
৬। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)
৭। ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারস
৮। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)
৯। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন
১০। গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
১১। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স
১২। বাংলাদেশ ইন্ডিজেনিয়াস পিপলস নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভারসিটি (বিপনেট)
১৩। নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)
১৪। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক
১৫। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
১৬। সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
১৭। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন
১৮। জাস্টিস ফর কমরেডস (জেএফসি)
১৯। বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন
২০। আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন পরিষদ

পরিশিষ্ট ৯

নাগরিকদের তালিকা

১। ড. রেহমান সোবহান
২। ড. রওনক জাহান
৩। মুফতি মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
৪। খুশি কবির
৫। অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
৬। সুব্রত চৌধুরী
৭। মুসা আল হাফিজ
৮। অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ
৯। শাহিন আনাম
১০। শহিদুল আলম
১১। মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী
১২। ড. বদিউল আলম মজুমদার
১৩। মুফতি সাইফুল ইসলাম
১৪। মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম (শায়খ আহমাদুল্লাহ-র পক্ষে)
১৫। অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান
১৬। মতিউর রহমান
১৭। ডা. জাহেদ উর রহমান
১৮। মাহফুজ আনাম
১৯। ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
২০। প্রফেসর মঈনুল ইসলাম
২১। নূরুল কবীর
২২। ড. মইনুল ইসলাম
২৩। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দীন খান
২৪। রাজা দেবাশীষ রায়
২৫। প্রফেসর মোঃ রবিউল ইসলাম
২৬। মাইকেল চাকমা
২৭। শহীদুল্লাহ ফরায়জী
২৮। সারোয়ার তুষার
২৯। সাইয়েদ আবদুল্লাহ
৩০। অরূপ রাহী
৩১। দীপক কুমার গোস্বামী
৩২। এডভোকেট আরিফ খান
৩৩। মাহা মির্জা
৩৪। ইমরান মাহফুজ
৩৫। ড. সৈয়দ নিজার
৩৬। ইলিরা দেওয়ান
৩৭। আসিফ আকবর
৩৮। মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
৩৯। ড. এ. কে. এম ফজলুর রহমান
৪০। এম আর চৌধুরী
৪১। মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা ও মাসুদ জাকারিয়া
৪২। আহমেদ আনিসুর রহমান
৪৩। ড. মহিউদ্দীন
৪৪। ড. মোঃ পারভেজ ইমদাদ
৪৫। জাকিয়া আফরিন
৪৬। প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম
৪৭। ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ
৪৮। শাহীন আলম (তুহিন) মোড়ল
৪৯। শহিদুল ইসলাম চৌধুরী
৫০। এডভোকেট আবদুর রহমান জীবল
৫১। মাহমুদুল হাসান
৫২। আরিফুল ইসলাম
৫৩। অধ্যাপক ড. ইকয়ামুল হক
৫৪। আবদুল্লাহ
৫৫। কল্লোল মুস্তফা
৫৬। মোঃ আলী হোসেন
৫৭। মোঃ সামছুল আরেফিন আরিফ
৫৮। মোহাম্মদ আহসানুল করিম
৫৯। মাওলানা মোঃ ইলিয়াছুর রহমান
৬০। এ বি এম আশরাফুল
৬১। আশিকুর রহমান আশিক
৬২। ফাইজা বর্ণা
৬৩। মারুফা আক্তার
৬৪। ইনজামুল হক জিম
৬৫। মোঃ ইয়াছিন আরাফাত
৬৬। তাসফিয়া আফরিন

৬৭। মোঃ মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস
৬৮। ড. মোঃ মনিরুল হুদা
৬৯। প্রফেসর ড. আবুল কালাম আযাদ
৭০। খোদাবক্স চৌধুরী
৭১। ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য
৭২। ড. ফস্টিনা প্যারেরা
৭৩। অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
৭৪। এস এইচ চৌধুরী

পরিশিষ্ট ১০

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের তালিকা

১। ড. কামাল হোসেন (কমিশনের সদস্যগণ তাঁর অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন)
২। এড. হাসনাত কাইয়ুম
৩। কে. শামসুদ্দিন মাহমুদ
৪। এ. কে. মোহাম্মদ হোসেন
৫। বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন
৬। বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
৭। বিচারপতি ইমান আলী

পরিশিষ্ট ১১

ওয়েবসাইট বিষয়ক তথ্য

সংবিধান সংস্কার কমিশন-এর দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে https://crc.legislativediv.gov.bd/ নামে কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা হয়।

সংবিধান সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা সংগঠনসহ অংশীজনদের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের ওয়েবসাইটের নিম্নবর্ণিত তিনটি ডোমেইন ইমেইল (domain email) চালু করা হয় যথা—

(১) crcbd@legislativediv.gov.bd;

(২) crcbd1@legislativediv.gov.bd; এবং

(৩) crcbd2@legislativediv.gov.bd।

কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্থাপিত ইমেইল crcbd1@legislativediv.gov.bd-তে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫০,৫৭৩ জন ব্যক্তি বা সংগঠন মতামত প্রদান করে।

এছাড়াও, কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন পরিচিতি, নোটিশ বোর্ডে সাম্প্রতিক তথ্য, অংশীজনের প্রস্তাব, কমিশনের প্রতিবেদন, যোগাযোগের ঠিকানা ও গুরুত্বপূর্ণ লিংক প্রদান করা হয়।

পরিশিষ্ট ১২

জরিপ বিষয়ে তথ্য

জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের নির্দেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ০৫-১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সময়ে 'সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় জনমত জরিপ (National Public Opinion Survey on Constitutional Reform). পরিচালনা করে। দেশের ৬৪টি জেলা হতে নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ১৮-৭৫ বছর বয়সের ৪৫,৯২৫ জন নাগরিকদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

জরিপের অংশগ্রহণকারীগণের সারসংক্ষেপ:

(১) লক্ষ্যমাত্রা নাগরিক-৪৬,৮০০ জন, জরিপে অংশগ্রহণ করেছেন ৪৫,৯২৫ জন।

(২) প্রতি জেলায় লক্ষ্যমাত্রা নাগরিক ৭২০ জন, অংশগ্রহণ করেছেন ৭১৭.৭২ জন।

জরিপে অংশগ্রহনকারীগণের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস (%)

বাংলাদেশ	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
	৩৪.১১%	৩৮.৬০%	০.০০৪৪%	৭২.৭১%	১২.৭৪%	১৪.৫৫%	২৭.২৯%	৪৬.৮৫%	৫৩.১৫%	০.০০৪৪%	১০০%

উক্ত জরিপে ২১,৫১৫ জন পুরুষ, ২৪,৪০৮ জন মহিলা এবং ২ জন তৃতীয় লিঙ্গসহ মোট ৪৫,৯২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

সারনী-১.১: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের জেলা, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (%)

বাংলাদেশ	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
	৩৪.১১	৩৮.৬০	০.০০৪৪	৭২.৭১	১২.৭৪	১৪.৫৫	২৭.২৯	৪৬.৮৬	৫৩.১৫	০.০০৪৪	১০০

সারনী-১.২: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের শিক্ষার শ্রেনি, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮.৩২	১০.১৪	০.০০০০	১৮.৪৬	১.৯৯	২.৭৬	৪.৭৫	১০.৩১	১২.৯০	০.০০০০	২৩.২১
প্রাথমিক	৯.৯৪	১০.৩২	০.০০৪৪	২০.২৬	৩.১৮	৩.৩৪	৬.৫২	১৩.১২	১৩.৬৬	০.০০৪৪	২৬.৭৮
মাধ্যমিক	১০.৬৪	১৪.৫১	০.০০০০	২৫.১৫	৪.৩১	৫.৮৭	১০.১৮	১৪.৯৬	২০.৩৮	০.০০০০	৩৫.৩৪
উচ্চ মাধ্যমিক	২.৯৮	২.৪৩	০.০০০০	৫.৪১	১.৪৯	১.৫৫	৩.০৪	৪.৪৭	৩.৯৮	০.০০০০	৮.৪৫
ডিপ্লোমা	০.১২	০.০২	০.০০০০	০.১৫	০.১০	০.০২	০.১২	০.২২	০.০৫	০.০০০০	০.২৭
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	০.০১	০.০৩	০.০০০০	০.০৪	০.০১	০.০২	০.০২	০.০১	০.০৫	০.০০০০	০.০৬
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	২.০৪	১.১৩	০.০০০০	৩.১৭	১.৬০	০.৯৭	২.৫৮	৩.৬৫	২.১০	০.০০০০	৫.৭৫
ডাক্তার	০.০২	০.০০	০.০০০০	০.০৩	০.০২	০.০১	০.০৩	০.০৫	০.০২	০.০০০০	০.০৬
প্রকৌশল	০.০৩	০.০০	০.০০০০	০.০৩	০.০৪	০.০০	০.০৪	০.০৭	০.০১	০.০০০০	০.০৮
মোট	৩৪.১১	৩৮.৬০	০.০০৪৪	৭২.৭১	১২.৭৪	১৪.৫৫	২৭.২৯	৪৬.৮৫	৫৩.১৫	০.০০৪৪	১০০.০০

সারনী-১.২.১: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের শিক্ষার শ্রেনি, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
কখনও স্কুল/মাদ্রাসায় যায়নি	৮.৩	১০.১	০	১৮.৪৬	১.৯৯০২	২.৭৬	৪.৭৫	১০.৩১	১২.৯০	০	২৩.২১
প্রাথমিক	৯.৯	১০.৩	০.০০৪৪	২০.২৬	৩.১৭৯২	৩.৩৪	৬.৫২	১৩.১২	১৩.৬৬	০.০০৪৪	২৬.৭৮
মাধ্যমিক	১০.৬	১৪.৫	০	২৫.১৫	৪.৩১১৫	৫.৮৭	১০.১৮	১৪.৯৬	২০.৩৮	০	৩৫.৩৪
উচ্চ মাধ্যমিক	৩.০	২.৪	০	৫.৪১	১.৪৮৯৪	১.৫৫	৩.০৪	৪.৪৭	৩.৯৮	০	৮.৪৫
ডিপ্লোমা	০.১	০.০	০	০.১৫	০.১০০২	০.০২	০.১২	০.২২	০.০৫	০	০.২৭
সেবিকা/ধাত্রীবিদ্যা	০.০	০.০	০	০.০৪	০.০০৬৫	০.০২	০.০২	০.০১	০.০৫	০	০.০৬
স্নাতক/স্নাতকোত্তর	২.০	১.১	০	৩.১৭	১.৬০৪৮	০.৯৭	২.৫৮	৩.৬৫	২.১০	০	৫.৭৫
ডাক্তার	০.০	০.০	০	০.০৩	০.০২১৮	০.০১	০.০৩	০.০৫	০.০২	০	০.০৬
প্রকৌশল	০.০	০.০	০	০.০৩	০.০৩৯২	০.০০	০.০৪	০.০৭	০.০১	০	০.০৮
মোট	৩৪.১	৩৮.৬	০.০০৪৪	৭২.৭১	১২.৭৪৩	১৪.৫৫	২৭.২৯	৪৬.৮৫	৫৩.১৫	০.০০৪৪	১০০.০০

সারনী-১.৩: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের বয়স, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (%)

জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক বিন্যাস	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
১৮-২৪	৪.৯৫	৬.৩৪	০.০০	১১.২৯	১.৭৩	২.৫৮	৪.৩১	৬.৬৮	৮.৯২	০.০০	১৫.৬০
২৫-৩৪	৬.৮৪	১০.৪৫	০.০০	১৭.৩০	২.৭৬	৪.২৫	৭.০১	৯.৬১	১৪.৭০	০.০০	২৪.৩১
৩৫-৪৪	৮.৪৯	৮.৭৯	০.০০	১৭.২৭	৩.৪২	৩.৩৮	৬.৮০	১১.৯১	১২.১৭	০.০০	২৪.০৮
৪৫-৫৪	৬.২১	৫.৯৪	০.০০	১২.১৫	২.৩২	২.০৬	৪.৩৮	৮.৫৩	৮.০০	০.০০	১৬.৫৩
৫৫-৬৪	৪.২৫	৪.৩০	০.০০	৮.৫৫	১.৫৫	১.৩৯	২.৯৪	৫.৮০	৫.৬৯	০.০০	১১.৪৯
৬৫-৭৫	৩.৩৬	২.৭৭	০.০০	৬.১৪	০.৯৬	০.৮৯	১.৮৫	৪.৩২	৩.৬৭	০.০০	৭.৯৯
মোট	৩৪.১১	৩৮.৬০	০.০০	৭২.৭১	১২.৭৪	১৪.৫৫	২৭.২৯	৪৬.৮৫	৫৩.১৫	০.০০	১০০.০০

সারনী-১.৪: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের পেশার ধরন, এলাকা ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাস (%)

পেশা/কাজের মর্যাদা	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
কৃষিকাজ	১৩.১২	০.৫৬	০.০০	১৩.৬৮	২.২৩	০.১৮	২.৪১	১৫.৩৫	০.৭৪	০.০০	১৬.৯
ব্যবসা	৫.১৭	০.০৯	০.০০	৫.২৬	৩.১১	০.১০	৩.২১	৮.২৮	০.১৯	০.০০	৮.৪৭
বেসরকারি চাকরি (এক্সিকিউটিভ)	০.২১	০.০৩	০.০০	০.২৪	০.২৬	০.০২	০.২৮	০.৪৭	০.০৫	০.০০	০.৫২
বেসরকারি চাকরি (অন্যান্য)	১.৫৮	০.১৮	০.০০	১.৭৬	১.০৬	০.১৬	১.২২	২.৬৫	০.৩৪	০.০০	২.৯৮
সরকারি চাকরি (৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব)	০.১৪	০.০৩	০.০০	০.১৭	০.১৫	০.০৪	০.১৯	০.২৯	০.০৭	০.০০	০.৩৫
সরকারি চাকরি (১০-২০তম গ্রেড)	০.২৪	০.০৩	০.০০	০.২৭	০.২৩	০.০৫	০.২৮	০.৪৭	০.০৭	০.০০	০.৫৪
বেসরকারি শিক্ষক	০.৩৫	০.১৩	০.০০	০.৪৮	০.১৭	০.১০	০.২৭	০.৫২	০.২৩	০.০০	০.৭৫
সরকারি শিক্ষক	০.১৬	০.১২	০.০০	০.২৭	০.০৯	০.০৯	০.১৮	০.২৫	০.২০	০.০০	০.৪৫
শ্রমিক/মজুর	৪.১৬	০.৩৬	০.০০	৪.৫২	১.৬২	০.১৭	১.৭৮	৫.৭৭	০.৫৩	০.০০	৬.৩০
গার্মেন্টস কর্মী	০.৭০	০.২৯	০.০০	০.৯৯	০.৪৪	০.২৭	০.৭১	১.১৪	০.৫৬	০.০০	১.৭০
রিক্সা/ভ্যান চালক	১.৪৯	০.০০	০.০০	১.৪৯	০.৫৬	০.০০	০.৫৭	২.০৬	০.০০	০.০০	২.০৬
পরিবহন শ্রমিক (ড্রাইভার, হেল্পার, সুপারভাইজার)	০.৩৭	০.০০	০.০০	০.৩৭	০.২১	০.০০	০.২২	০.৫৯	০.০০	০.০০	০.৫৯
হোটেল/রেস্টুরেন্ট কর্মী	০.৮২	০.০২	০.০০	০.৮৪	০.৪৬	০.০৩	০.৪৮	১.২৮	০.০৫	০.০০	১.৩৩
গ্রহকর্মী	০.০২	০.৬৮	০.০০	০.৬৯	০.০১	০.৩০	০.৩০	০.০৩	০.৯৭	০.০০	১.০০
ছাত্র	১.৮৯	১.১১	০.০০	৩.০১	০.৭৪	০.৭১	১.৪৫	২.৬৪	১.৮২	০.০০	৪.৪৬
বেকার	১.৩৪	০.৪০	০.০০	১.৭৪	০.৫১	০.১৮	০.৬৮	১.৮৪	০.৫৭	০.০০	২.৪২
অবসরপ্রপ্ত/বয়স্ক/অক্ষম	১.৪৯	১.৪৯	০.০০	২.৯৮	০.৬৪	০.৫৫	১.১৮	২.১২	২.০৪	০.০০	৪.১৬
গৃহিণী	০.৩৭	৩৩.০৩	০.০০	৩৩.৪০	০.১০	১১.৫৮	১১.৬৮	০.৪৭	৪৪.৬০	০.০০	৪৫.০৭
অন্যান্য	০.৪৯	০.০৬	০.০০	০.৫৫	০.১৬	০.০৫	০.২১	০.৬৫	০.১১	০.০০	০.৭৬
মোট	৩৪.১১	৩৮.৬০	০.০০	৭২.৭১	১২.৭৪	১৪.৫৫	২৭.২৯	৪৬.৮৫	৫৩.১৫	০.০০	১০০.০০

সারনী-১.৫: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের মধ্যে কমর্রতদের সেক্টর, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (%)

সেক্টর	এলাকা								
	গ্রাম			শহর			মোট		
	লিঙ্গ			লিঙ্গ			লিঙ্গ		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কৃষি	৩২.০৭	২.০৪	৩৪.১১	৫.৮৪	০.৫১	৬.৩৬	৩৭.৯১	২.৫৫	৪০.৪৬
শিল্প	৫.৪৪	০.৭৮	৬.২৩	২.৮১	০.৬১	৩.৪২	৮.২৫	১.৩৯	৯.৬৫
সেবা	২৮.৬২	৩.০২	৩১.৬৪	১৫.৮৬	২.৩৯	১৮.২৫	৪৪.৪৮	৫.৪১	৪৯.৮৯
মোট	৬৬.১৩	৫.৮৪	৭১.৯৮	২৪.৫১	৩.৫১	২৮.০২	৯০.৬৪	৯.৩৬	১০০.০০

সারনী-১.৬: জরিপে অংশগ্রহণকারিগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস (%)

ধর্ম	এলাকা										
	গ্রাম				শহর			মোট			
	লিঙ্গ				লিঙ্গ			লিঙ্গ			
	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া/ তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
মুসলমান	৩০.৪৫	৩৪.৮৯	০.০০	৬৫.৩৫	১১.০৫	১২.৭১	২৩.৭৬	৪১.৫০	৪৭.৬০	০.০০	৮৯.১১
হিন্দু	৩.০৮	৩.১১	০.০০	৬.১৯	১.২৮	১.৪৫	২.৭৩	৪.৩৬	৪.৫৬	০.০০	৮.৯২
খ্রিষ্টান	০.১২	০.১০	০.০০	০.২২	০.০৩	০.০৩	০.০৬	০.১৫	০.১৪	০.০০	০.২৮
বৌদ্ধ	০.৪৪	০.৪৭	০.০০	০.৯১	০.৩৮	০.৩৫	০.৭৩	০.৮২	০.৮২	০.০০	১.৬৪
অন্যান্য	০.০২	০.০২	০.০০	০.০৪	০.০১	০.০০	০.০১	০.০২	০.০৩	০.০০	০.০৫
মোট	৩৪.১১	৩৮.৬০	০.০০	৭২.৭১	১২.৭৪	১৪.৫৫	২৭.২৯	৪৬.৮৫	৫৩.১৫	০.০০	১০০.০০

পরিশিষ্ট ২০

সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	মন্তব্য
১	জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
২	জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
৩	জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন	একান্ত সচিব (উপসচিব) কমিশন প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন	১৫-১২-২০২৪ থেকে ১৫-০১-২০২৫ পর্যন্ত
৪	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাফরী	একান্ত সচিব (উপসচিব) কমিশন প্রধান, সংবিধান সংস্কার কমিশন	০৩-১১-২০২৪ থেকে ৫-১২-২০২৪ পর্যন্ত
৫	জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান	সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৬	জনাব মোঃ সাহিনুর রহমান	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
৭	মিজ ফাহমিদা বেগম	সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
৮	জনাব ফ. ব. ম রুহুল আমিন	উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৯	জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদ	উপপরিচালক (গণসংযোগ-২) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	৩১-১০-২০২৪ থেকে ১৮-১১-২০২৪ পর্যন্ত
১০	জনাব মোঃ আলাউদ্দীন	উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১১	জনাব এইচ. এম. আলী আকবর	উপপরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১২	জনাব মোঃ আল-আমিন	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১৩	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১৪	বেগম ফারজানা আক্তার	সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং) জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১৫	জনাব এ কে এম ফেরদৌস	তথ্য অফিসার তথ্য অধিদপ্তর	১১-১২-২০২৪ থেকে ১৫-০১-২০২৫ পর্যন্ত
১৬	জনাব মোঃ হোছাইন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
১৭	জনাব নাজমুল ইসলাম	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১৮	জনাব মোঃ এনসান	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
১৯	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
২০	জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক মজুমদার	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২০-১০-২০২৪ থেকে ১৭-১১-২০২৪ পর্যন্ত
২১	জনাব মোঃ জুয়েল মিয়া	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০৫-১১-২০২৪ থেকে ১৭-১১-২০২৪ পর্যন্ত

২২	জনাব আখতারুজ্জামান	অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
২৩	জনাব মোঃ মিনারুল ইসলাম	অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
২৪	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
২৫	জনাব মোঃ ফোরকান শেখ	কামরা পরিচারক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
২৬	জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ	অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
২৭	জনাব আবদুল্লাহ আল মনছুর পলাশ	অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০৪-১১-২০২৪ থেকে ১৯-১১-২০২৪ পর্যন্ত
২৮	জনাব দেলোয়ার হোসেন	অফিস সহায়ক জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০৪-১১-২০২৪ থেকে ১৯-১১-২০২৪ পর্যন্ত
২৯	জনাব বিল্লাল হোসেন	অভ্যর্থনাকারী জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৩০	মোছাঃ মনিরা খাতুন	অভ্যর্থনাকারী জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৩১	বেগম ইসরাত জাহান জিনিয়া	অভ্যর্থনাকারী জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৩২	জনাব শহিদুল ইসলাম	পরিচ্ছন্নতাকর্মী জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৩৩	জনাব আবুল হাসান সজিব	পরিচ্ছন্নতাকর্মী জাতীয় সংসদ সচিবালয়	
৩৪	জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	ড্রাইভার সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	
৩৫	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	ড্রাইভার জাতীয় সংসদ সচিবালয়	

পরিশিষ্ট ২১

গবেষকগণের তালিকা

১। আলী মাশরাফ
২। আনিকা নাওয়ার
৩। খান খালিদ আদনান
৪। ফারান মোঃ আরাফ
৫। তাহসিন নূর সেলিম
৬। আবুজার গিফারী
৭। সাদমান রিজওয়ান অপূর্ব
৮। মোঃ তারিক মোর্শেদ
৯। মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম
১০। মোনা আব্দুল হালিম
১১। মোঃ লোকমান হোসাইন
১২। মোঃ মুসা মিয়া
১৩। মোহাম্মদ জাকারিয়া
১৪। মওদুদ আহম্মেদ সুজন
১৫। তরিকুল ইসলাম অনিক
১৬। আল আমিন হাওলাদার
১৭। শাহ মোঃ জিয়াউল ইসলাম
১৮। মোঃ সোহাগ মিয়া
১৯। ফয়জুল্লাহ
২০। সাবরিনা আলম
২১। খালেদ মাহমুদ আকাশ
২২। মুহাঃ মুজাহিদুল ইসলাম
২৩। মোঃ আলকামা
২৪। মোছাঃ উম্মে কুলসুম ইতি
২৫। বিপ্লব কান্তি সরকার
২৬। মোঃ রবিউল ইসলাম
২৭। মোঃ রকিব হাসান
২৮। সহুল আহমদ মুন্না
২৯। মোঃ আক্তারুজ্জামান
৩০। মোঃ মাহাদী হাসান কাব্য
৩১। আব্দুস সালাম আজাদ
৩২। মোহাম্মদ সোহেল রহমান